

নক্ষত্রলোকের দেবতা

নারায়ণ সান্যাল

A Book of Kuntal



॥ আশির দশকের 'কৈফিয়ৎ' ॥

গ্রন্থটি রচনার পর এক যুগ অতিক্রান্ত—যদি দ্বাদশবর্ষকালকে 'যুগ' বলে ধরা যায়। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান অনেক-অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে। আইনস্টাইনের সূত্রগুলির নানান নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমি কিন্তু আলডুস্ হাক্সলের পদাঙ্ক-অনুসরণে এই সংস্করণে কোনও তথ্যগত পরিবর্তন করছি না। হাক্সলে তাঁর 'ব্রেড নিউ ওয়ার্ল্ড' লিখেছিলেন ১৯৩২-এ; পরবর্তী সংস্করণে তার কোনও তথ্যগত পরিবর্তন করেননি, যদিও ততদিনে পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ হয়েছে। বরং তিনি লিখেছিলেন, 'ব্রেড নিউ ওয়ার্ল্ড রিভিজিটেড' (১৯৫৯)। আর্থার সি. ক্লার্কও তাঁর 'স্পেস ওডিসি ২০০১'-কে অপরিবর্তিত রেখে রচনা করেছিলেন, 'স্পেস ওডিসি ২০১০'।

আমি স্বভাবগতভাবে পল্লবগ্রাহী। 'নক্ষত্রলোকের' কথায় আমার মন নেই। বর্তমানে মেতে আছি কীট-পতঙ্গ নিয়ে। সারা গায়ে মহানন্দে মাখছি এই 'মধুময় ধরণীর ধূলি'-ই!

আশা করি আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন।

নারায়ণ সান্যাল

২৬.৪.১৯৮৭

তৃতীয় পর্ব

স্থান : ঘটনা পরম্পরা
কাল : মাপবার সংযুক্ত মাপকাঠি
পাত্র : প্রফেসর আলবার্ট আইনস্টাইন

॥ এক ॥

নিউটনের প্রসঙ্গ উঠলেই আমরা চট করে বলে দিতে পারি—তঁার বাগানে একটা আপেল গাছ ছিল; সেই গাছ থেকে তিনি পাকা-আপেলটির মতো মাধ্যাকর্ষণকে একদিন টুপ করে পড়তে দেখেছিলেন। তেমনি আইনস্টাইনের নাম শুনলে আমরা বিদ্যেবাগীশের কাছে শুনি : তিনি ফোর্থ ডাইমেনশনের সুড়ঙ্গপথে অভিযান চালিয়ে ‘রিলেটিভিটি’ বস্তুটাকে আবিষ্কার করেন। যদি প্রশ্ন তুলি—‘রিলেটিভিটি’ কী অথবা ‘ফোর্থ ডাইমেনশনটা কী জাতের জন্তু’? ধমক শুনতে হয়—‘বড় বড় পণ্ডিতেই ও-সব তত্ত্ব বোঝেন না, তোমাকে কেমন করে বোঝাই হে বাপু! তবে হ্যাঁ, আবিষ্কারটা যুগান্তকারী, কালজয়ী, সহস্রাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার! আরও ভালো ভালো বিশেষণ আছে, অভিধানে খুঁজে দেখ!’—ব্যস! লেঠা চুকে গেল।

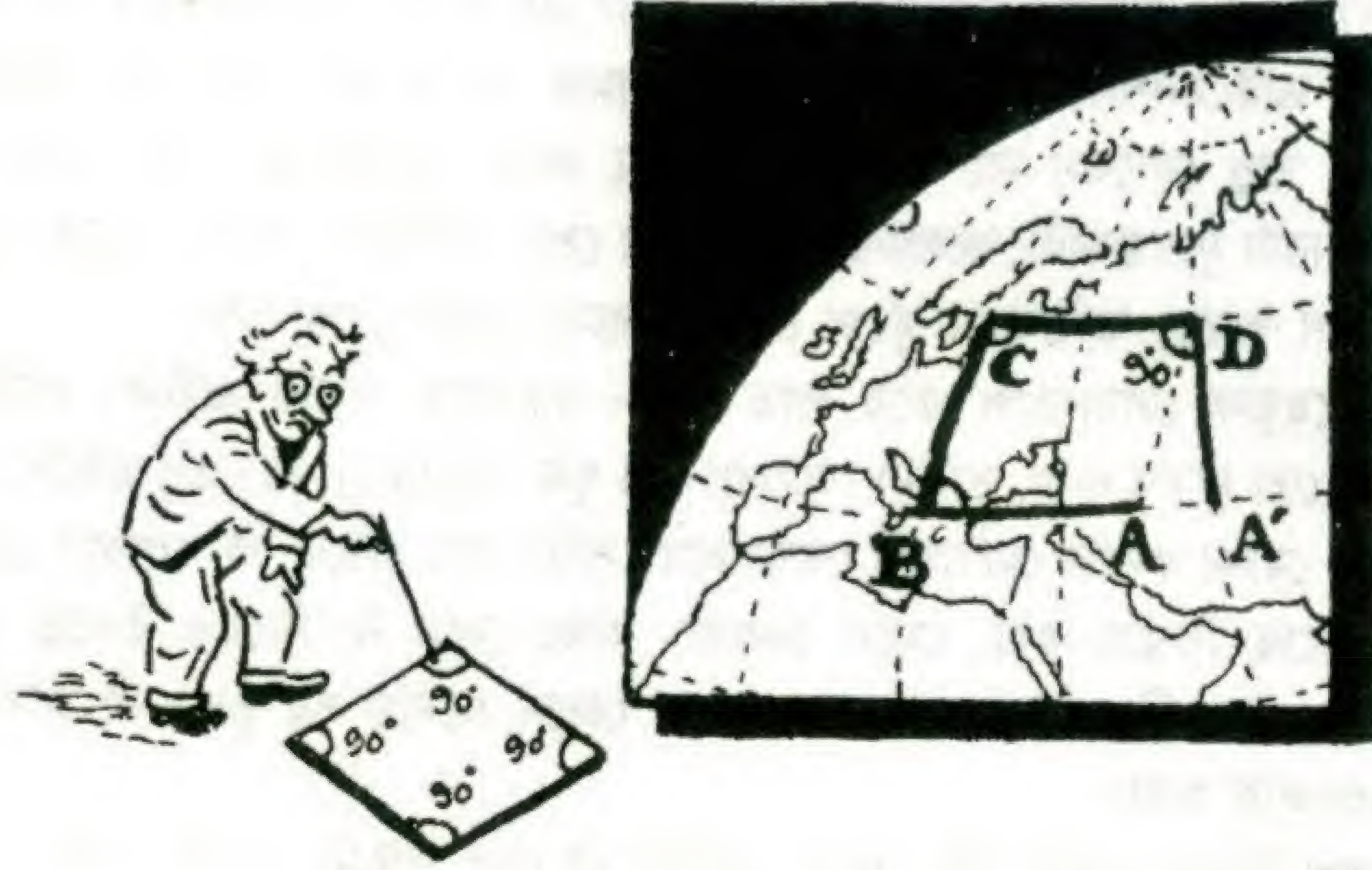
অহেতুক দোষারোপ করে লাভ নেই—ব্যাপারটা সত্যই জটিল। গাণিতিক ব্যাখ্যা তো দূরের কথা, তাত্ত্বিক-আলোচনাও ঘুম-পাড়ানিয়া নয়। তবু হয়তো চেষ্টা করলে মোদা কথাটা মোটামুটি বোঝা যায়। সত্যি কথা বলতে কি, বোঝার চেয়েও শক্ত হচ্ছে বিশ্বাস করা, মেনে নেওয়া। অথচ মেনে না নিয়েও উপায় নেই। এতকাল বাপ-পিতামোর আমল থেকে যা জেনে এসেছি সব ভুল—ঐ অবিশ্বাস্য কথাগুলোই সত্য!

প্রশ্ন উঠবে—ভুল যদি, তবে এতদিন তা টের পাইনি কেন? অঙ্কের গলদ এতদিন নজরে পড়েনি কেন? সহজবোধ্য জবাব—বাজারের হিসাবে এক নয়া-পয়সার ঘাটতি হলে তুমি সেটা মেনে নাও, বল ও চব্বিশ নয়া পয়সাও যা, চার আনাও তাই। কিন্তু বাসের টিকিটের বেলায় তা মানতে চাইবে না; কারণ মাসে যদি তোমাকে একশবার টিকিট কাটতে হয় তবে মাসিক নগদ একটি টাকা খসছে। প্রাক্-আইনস্টাইন যুগের মহাজাগতিক হিসাবের বেলায় ঐ এক নয়া পয়সার হের-ফের পরবর্তী যুগে রীতিমতো গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে শুরু করল। সেটার গুরুত্ব তখন মাত্র ‘এক নয়া পয়সা’ নয়। এ তত্ত্বটা বিজ্ঞান এতদিন খেয়াল করেনি, জানত না।

কেমন জান? একটা উদাহরণ দিলেই বুঝবে। ধর, সহজ একটা জ্যামিতিক সত্য—একটা ‘স্কোয়ারে’র, মানে বর্গক্ষেত্রের চারটে বাহু সমান, এটা তো মানবে? আমি বলব—না, ওটা পার্থিব সত্য নয়। ধর আমড়াতলার মোড় থেকে তুমি সিধে পশ্চিম-মুখো হাজার কিলোমিটার হেঁটে গেলে। হাজার কিলোমিটার পশ্চিমে গিয়ে তুমি ডাইনে মোড় ফিরে সিধে আবার এক হাজার কিলোমিটার উত্তর-মুখে গেলে, সেখানে পৌঁছে আবার ডাইনে ফিরে সিধে এক হাজার কি.মি. পূর্ব-মুখো গেলে। সেখানে পৌঁছে শেষবার ডাইনে ফিরে নাক-বরাবর আবার হাজার কিলোমিটার দক্ষিণে এলে। এবার কোথায় পৌঁছাবে তুমি? আঙে না, ‘আমড়াতলার মোড়ে’ নয়। ‘যেথায় খুশী’! কারণটা বোঝা যাবে চিত্র—১০-এর দিকে তাকালে;

ছবিতে 'A' হচ্ছে 'আমড়াতলার মোড়'। বর্গক্ষেত্র পরিক্রমা শেষ করে তুমি এসে পৌছাবে A' বিন্দুতে। চিত্রে $AB = BC = CD = DA'$ । প্রতিটি হাজার কিলোমিটার। প্রতিটি বিন্দুতেই সমকোণ রচনা করা হয়েছে—কিন্তু শেষবার CD থেকে সমকোণ রচনা করলে আমরা DA পথে আসব না—আসব দ্রাঘিমা রেখা DA' বরাবর, তাই নয়?

তার মানে কি জ্যামিতির উপপাদ্যগুলো সব ভুল? না, ভুল নয়—জ্যামিতি নির্ভুল থাকবে কাগজের উপর, যার দুটি মাত্র মাত্রা—দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ। পৃথিবী তো দ্বি মাত্রিক



চিত্র—১০

নয়। ত্রি-মাত্রিক ঘন বস্তু। তাই ঐ গুণ্ডগোলটা হচ্ছে। অবশ্য ভুলটা এসব ক্ষেত্রে খুবই সূক্ষ্ম। তাই জ্যামিতির সূত্র ধরে বাস্তবজীবনের জমি জরীপ করা চলে; গোটা দেশের জমি জরীপ করা চলে না। তার জন্য ঘন জ্যামিতির আইন-কানুনের আলাদা হিসেব। কাগজের দুনিয়া আর বাস্তবের পৃথিবী তো এক নয়।

আইনস্টাইন আর এক ধাপ এগিয়ে বললেন—পৃথিবীটা তিন-মাত্রার হতে পারে—বিশ্বপ্রপঞ্চ চার-মাত্রার। ফলে মহাজাগতিক যে-সব সূত্র কেপলার-গ্যালিলেও-নিউটন বলে গেছেন, তা মহাজাগতিক অর্থে সত্য নয়। ঐ সব ফর্মুলায় ফেলে এ পৃথিবীর ঐ বাস্তবজীবনের জমিটুকুই নির্ভুল (অর্থে নির্ভুল নয়, বাস্তব প্রয়োগে) মাপতে পার, সূর্য-নক্ষত্র-নীহারিকার ক্ষেত্রে ঐ হিসেবে রীতিমতো হেরফের হবে।

'চারমাত্রায় বিশ্বপ্রপঞ্চ' ব্যাপারটা বুঝি-না-বুঝি, 'অ্যানালজি' থেকে একটু বোঝা যাচ্ছে, কেন এতদিন কেপলার-গ্যালিলেও-নিউটনের সূত্র ধরে আমরা কাজ চালিয়ে আসতে পেরেছিলাম—আমরা এবং আমাদের বাপ-পিতেমো। ঐ যে বিশ্বপ্রপঞ্চের চতুর্মাত্রিক মূল-স্বরূপ তার ছন্দটা আইনস্টাইন ধরতে পেরেছিলেন ধাপে ধাপে। তিনটি পর্যায়ে তিনি বিশ্ব-বিজ্ঞানকে সে পরম সত্যটি উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর

প্রথম দান 'স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি' (১৯০৫); দ্বিতীয় দান 'জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি' (১৯১৬) এবং শেষ দান—দীর্ঘ তেত্রিশ বছর গবেষণার পর 'দ্য যুনিফায়েড ফিল্ড থিওরি' (১৯৪৯)।

বিশ্বপ্রপঞ্চের ঐ যে নন্দন-ছন্দ—যে-ছন্দে পরমাণুর অভ্যন্তরে না-ধর্মী বৈদ্যুৎ হাঁ-ধর্মী বৈদ্যুতের চারিদিকে আবর্তিত হচ্ছে, যে ছন্দে নক্ষত্র-নীহারিকা মহাশূন্যে ধাবমান—তাকে বুঝব কী দিয়ে? মাপব কী করে? সম্বলের মধ্যে তো আছে মাত্র পাঁচটি ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধি। গ্রহ-নক্ষত্রের ব্যাপারে আবার পঞ্চেন্দ্রিয়ার মধ্যে একমাত্র একটিই কার্যকরী হচ্ছে, দৃষ্টি। বাকি চারটির কেবলমাত্র এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু চোখ দিয়েই বা কতটুকু দেখতে পাই? এ তো বিনুক দিয়ে সাগর মাপা!

ইংরাজ দার্শনিক জন লক বলেছিলেন, বস্তুতে 'গুণ' দুই প্রকার—প্রাথমিক (Primary) এবং অপ্রধান (Secondary)। তাঁর মতে বস্তুর আকৃতি, কাঠিন্য, গতি ইত্যাদি বাস্তব, সেগুলি তার প্রাথমিক গুণ—সেগুলি বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। অপরপক্ষে বস্তুর বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি তার অপ্রধান গুণ—যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধের নিরিখে বস্তুতে আরোপিত মাত্র। পরবর্তী দার্শনিকেরা এ চিন্তাধারার কৃত্রিমতা অনুধাবন করেছিলেন। জার্মান গাণিতিক পণ্ডিত লিবনিৎজ বললেন, "বর্ণ, গন্ধ, উত্তাপই শুধু নয়, বস্তুর গতি, আকৃতি, সম্প্রসারণ ইত্যাদিও আপাত-প্রতীয়মান আরোপিত গুণ মাত্র।" পিংপঙের বলটাকে চোখে দেখে বলছি ওটা সাদা, গোল, ছোট—তেমনি সেটা হাতে নিয়ে বলছি ওটা হালকা, মসৃণ। আসলে এগুলি পিংপঙ বলের বস্তুনিহিত নিজস্ব গুণ আদৌ নয়, আমার চৈতন্যগ্রাহ্য জগতে তার আরোপিত অভিধা মাত্র।

ক্রমশ দেখছি পশ্চিমখণ্ডের দার্শনিক আর বিজ্ঞানীরা সেই সিদ্ধান্তের দিকেই এগিয়ে যেতে চাইছেন, যা নাকি অদ্বৈত বেদান্তের শাস্ত্রভাষ্য—প্রতিটি বস্তুই যেহেতু তার গুণের সমাহার এবং যেহেতু সেই গুণের অবস্থান শুধুমাত্র আমার চৈতন্য বা মনে সুতরাং এই বিশ্বপ্রপঞ্চ, বস্তু ও শক্তি—পরমাণু থেকে 'পালসার' আছে শুধুমাত্র আমার মনোজগতে বা চৈতন্যে। তার বাস্তব অস্তিত্ব শুধুমাত্র 'মায়া'। আইনস্টাইন ঐজাতীয় চিন্তাধারাকে ক্ষুরধার গণিতের পথে নিয়ে গেলেন আমাদের ধ্যান ধারণার শেষ সীমান্তে। বললেন, 'স্থান' আর 'কাল' এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুটি পৃথক ধারণা নয়; স্থান বা মহাকাশের কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই, সময় বা 'কাল'-এর কোন নিরপেক্ষ সংজ্ঞা নেই—'স্থান ও কাল'কে আমরা সংযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারি কতকগুলি জাগতিক ঘটনা-পরম্পরা মাপতে—ওরা শুধুমাত্র মাপকাঠি।

যদিও গণিতের মাধ্যমে পেলেন তবু এ সূত্র যেন দর্শনের রাজ্যে। কিন্তু বিজ্ঞানও একে উড়িয়ে দিতে পারল না। বিজ্ঞান চিরকাল বলে এসেছে—যে তত্ত্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ পাব না তা মানি না। এ বিশ্বপ্রপঞ্চকে 'মায়া' বলে মানব কেন? দু চোখ ভরে বিশ্বকে দেখছি না? দর্শন বলছে, ভেবে দেখ, কতটুকু তোমার দৃষ্টিশক্তির সীমা!

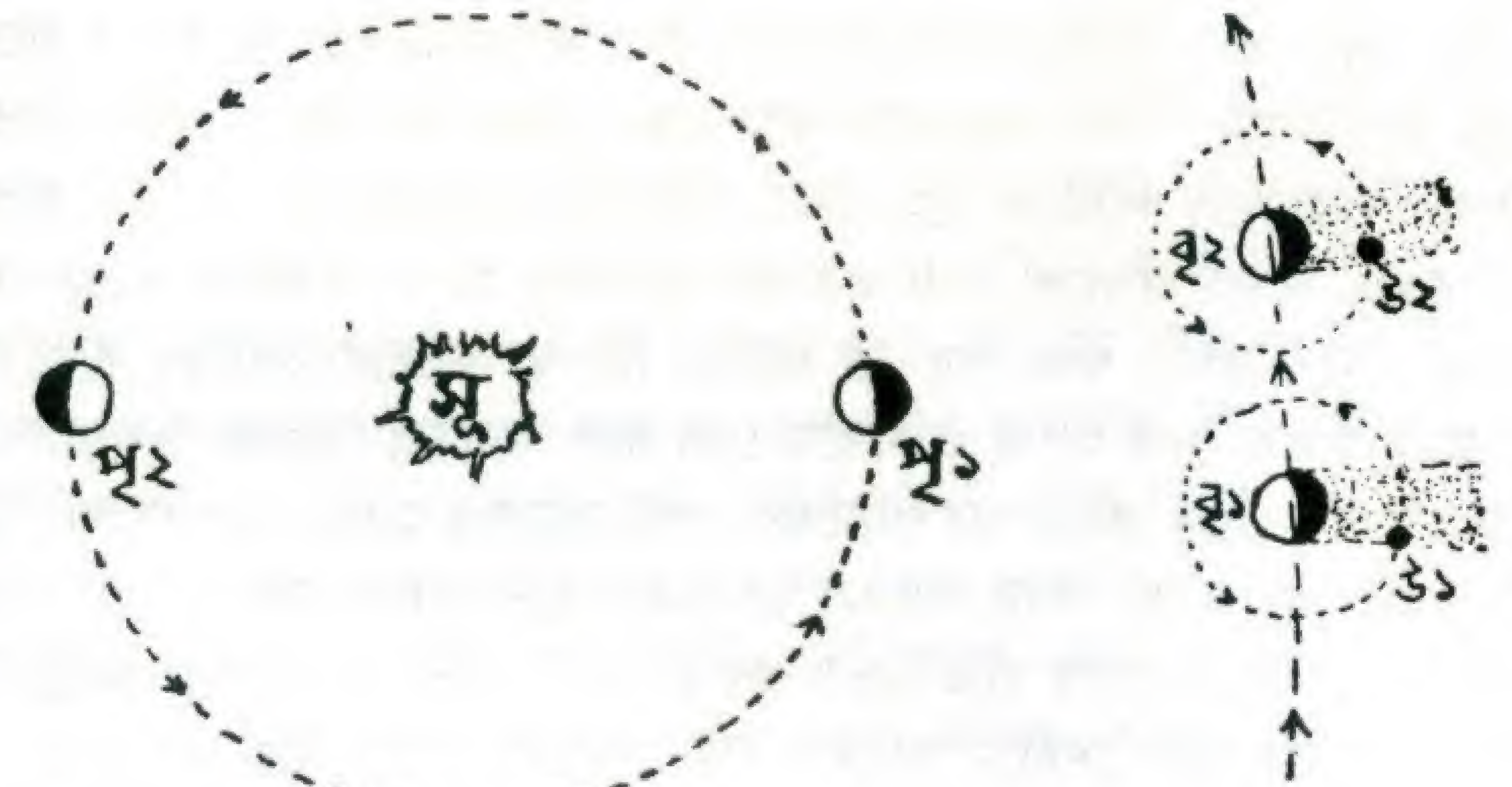
বিজ্ঞানকে থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে—তা বটে! দৃষ্টিপথে কতটুকু দেখি? বিজ্ঞানই বলেছে—দেখতে হলে ‘আলো’ চাই। ‘আলো’ কি! এক জাতের ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ। কিন্তু সে তরঙ্গ-ভঙ্গিমার অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ আমার দৃষ্টিশক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—বাদবাকি নিছক অন্ধকার। লাল আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য .০০০০৭ সেন্টিমিটার, আর ‘অতি বেগুনী’ বা ভায়োলেটের .০০০০৪ সেমি। এটুকুই দেখি চোখে। এর ডাইনেও আঁধার, বাঁয়েও আঁধার। লাল-উজানী-আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সামান্য বেশি—.০০০০৮ থেকে ০৩২ সেমি। তা চোখে দেখি না, ত্বক তা অনুভব করতে পারে। আবার বেগুনী-পারের আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সামান্য খাটো, —০০০০৩ থেকে ০০০০১ সেমি; তাই তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আদৌ নয়। তা শুধু ক্যামেরায় ধরা পড়ে। বেগুনী-পারের আলোর চেয়েও যে ‘আলোক তরঙ্গ’ মাপে ছোট, তাকে বলি ‘এক্স-রে’। এ-ছাড়া আরও নানান দৈর্ঘ্যের ‘আলো’র তরঙ্গ আছে—গামা-রে, রেডিও-তরঙ্গ, মহাজাগতিক-রশ্মি ইত্যাদি। যেহেতু তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তাই তাদের ‘আলো’ বলে মানতেই চাই না।

তাহলে পরিদৃশ্যমান জগৎ কেমন করে সত্য? এসব তরঙ্গ-ভঙ্গ যদি তোমার আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়ত তাহলে তো দুনিয়াকে অন্যরকম বোধ হত। এক্স-রে রশ্মি যদি চোখে ধরা দিত তাহলে বস্তিচেল্লির ‘ভেনাস’ দেখতে গিয়ে কঙ্কাল দেখে আঁতকে উঠতুম।

তার মানে যা দেখছি তাই সত্য নয়। সীমিত দৃষ্টি দিয়ে যা দেখছি তা আমার ‘মনগড়া’ দুনিয়া, মায়াময় জগৎ। বিশ্বকে বুঝে নিতে হবে বোধের নিরিখে—বুদ্ধি দিয়ে। অন্ধ কষে।

আলোর গতি : আপেক্ষিকতা-তত্ত্বের উপর আলোকপাত করতে হলে সবার আগে সেই আলোর গতি-প্রকৃতির একটা ধারণা নিতে হবে। আলো যে নিখুঁত সরল-রেখায় চলে না, অতি ছোট ছোট তরঙ্গের আকারে চলে এ তত্ত্বটা বুঝতে পারার আগেই আলো নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল। মধ্যযুগের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দেকার্তের (১৫৯৬-১৬৫০) ধারণা ছিল আলোর গতি অসীম; কিন্তু গ্যালিলেও-র (১৫৬৪-১৬৪২) বিশ্বাস সেটা মোটেই অসীম নয়। গ্যালিলেও-র জীবদ্দশাতেই ফরাসী বৈজ্ঞানিক মার্সেন শব্দের গতি মোটামুটি বার করে ফেললেন। গ্যালিলেও তাই দেখে এক অন্ধকার রাত্রে লণ্ঠন হাতে আলোর গতি মাপতে বার হলেন, কিন্তু তাঁর সরল যন্ত্রের সাহায্যে সেটা মেপে বার করা তাঁর সময়ে অসম্ভব ছিল। বস্তুত তাঁর ধারণার কোনও বাস্তব প্রমাণ তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। তবে তাঁরই আবিষ্কৃত দূরবীনের সাহায্যে দিনেমার বৈজ্ঞানিক রোমার কী ভাবে আলোর গতিবেগটা মোটামুটিভাবে বার করে ফেলেন সেটা বুঝে নিতে খুব বেশি অন্ধ কষতে হবে না। রোমার বুঝতে পেরেছিলেন—আলোর গতি অসীম না হলেও সেটা অত্যন্ত বেশি। বস্তুত আলোর গতিবেগ শব্দের গতির চেয়ে প্রায় সওয়া-আট লক্ষ গুণ বেশি। দুটো গতিবেগের কোন তুলনাই হয় না। রোমার অন্তত এটুকু বুঝতে পারলেন যে, পৃথিবীতে কোথাও আলো জ্বলে গ্যালিলেও-র পদ্ধতিতে

আলোর গতিটা মাপা যাবে না। মহাকাশ থেকে ভেসে-আসা কোন আলোকরশ্মি কতটা সময়ে কতটা দূরত্ব যাচ্ছে সেটা হিসাব করে বার করতে হবে। গ্যালিলেও নিজেই তাঁর দূরবীনের সাহায্যে বৃহস্পতি গ্রহের চার-চারটে উপগ্রহ দেখতে পেরেছিলেন (বৃহস্পতির ষাটের কোলে তেরোটি চাঁদের-টুকরো ছানাপোনা আছে)। আমাদের চাঁদ যেমন নিখুঁত সময়ের ব্যবধানে (২৭.৩২১৬৬১৪৮ পার্থিব দিনে) পৃথিবীর চারদিকে এক পাক ঘুরে আসে ঠিক তেমনি বৃহস্পতির একটি বিশেষ উপগ্রহ ৪২.৫ ঘণ্টায় বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর তুলনায় চাঁদ যত ছোট বৃহস্পতির তুলনায় তার সেই উপগ্রহ অনেক-অনেক বেশি ছোট; তাই যদিও আমাদের চাঁদের প্রতিদিন ‘চন্দ্রগ্রহণ’ হয় না, বৃহস্পতির সেই উপগ্রহটির প্রতিদিনই গ্রহণ হয়। রোমার-সাহেব লক্ষ্য করে দেখলেন—বৃহস্পতির ঐ উপগ্রহে ‘চন্দ্র-গ্রহণ’ হচ্ছে ৪২ $\frac{১}{২}$ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানে। তার অর্থ—ঐ উপগ্রহটি ৪২ $\frac{১}{২}$ ঘণ্টায় বৃহস্পতিকে একবার প্রদক্ষিণ করেছে। তিনি আরও লক্ষ্য করে দেখলেন, ঐ সময়ের ব্যবধানটা সব সময় সমান থাকছে না। প্রতিদিনই সেই চন্দ্রগ্রহণের সময়টা



চিত্র—১১

একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছে। সময়ের ব্যবধানটা বাড়তে বাড়তে ছয় মাস পরে দেখা গেল সেটা হয়েছে ১০০ সেকেন্ড, অর্থাৎ ষোলো মিনিটেরও বেশি। তার হেতুটা বোঝা যাবে চিত্র—১১-র দিকে তাকালে। প্রথম অবস্থায় পৃথিবী যখন পৃ-১ অবস্থানে ছিল তখন বৃহস্পতির ঐ চাঁদটি ছিল উ-১ অবস্থানে। ছয় মাস পরে পৃথিবীর অবস্থান পৃ-২-তে। যেহেতু বৃহস্পতি গ্রহ অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে সূর্য-প্রদক্ষিণ করেছে তাই ঐ ছয় মাসের ব্যবধানে তার অবস্থানের বদল হয়েছে বৃ-১ থেকে একটু দূরে বৃ-২-তে। তার মানে ছয় মাস পরে রোমার সাহেব পৃ-২ অবস্থান থেকে যখন বৃহস্পতির চন্দ্রগ্রহণ দেখছেন তখন সেই উপগ্রহটি আছে উ-২ অবস্থানে। বৃহস্পতির সামান্য স্থান-পরিবর্তনকে ধর্তব্যের মধ্যে না নিলে

বলতে পারি চন্দ্রগ্রহণ পেছিয়ে যাবার আসল কারণটা হচ্ছে যেহেতু আলোকরশ্মিকে পৃ-১ থেকে পৃ-২ এই দূরত্বটা অতিক্রম করতে হচ্ছে। অর্থাৎ পৃথিবী যে উপবৃত্তের (ellipse) আকারে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তার পরাক্ষ (major axis)-টুকু পার হতে আলোর সময় লাগছে ১০০০ সেকেন্ড। (পৃথিবী প্রায় বৃত্তের আকারে সূর্য-প্রদক্ষিণ করে। চিত্রে বৃত্তই আঁকা হয়েছে। ফলে মেরুর অ্যাক্সিস হয়েছে বৃত্তের ব্যাস) রোমারের সময়ে ওঁরা জানতেন ঐ পরাক্ষের মাপ, অর্থাৎ পৃ-১ থেকে পৃ-২ দূরত্ব ১,৭২,০০০,০০০ মাইল। তাই তিনি সংখ্যাটাকে এক হাজার দিয়ে ভাগ করে বললেন, আলোর গতি সেকেন্ডে ১,৭২,০০০ মাইল। আমরা বর্তমানে জানি, পৃথিবীর সূর্য-প্রদক্ষিণ-পথের ঐ পরাক্ষের দৈর্ঘ্য ১,৮৬,০০০,০০০ মাইল। তাই হিসাবমতো আলোর গতি সেকেন্ডে প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল বা প্রায় ৩,০০,০০০ কিলোমিটার।

প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক জেমস ব্রাডলে এবং আরও অর্ধ শতাব্দী পরে ‘ফিজু’, ‘ফুকো’ এবং বর্তমান শতাব্দীতে মার্কিন নোবেল-লরিয়েট পদার্থ-বিজ্ঞানী মাইকেলসন আলোর ঐ গতিকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্ধারণ করলেন। আরও দেখা গেল, মহাশূন্যে আলোর যা গতি জলের ভিতর, বা কাচের মতো স্বচ্ছ কোন কিছুর ভিতর তার গতি কমে যায়। যেমন বলা যায়—জলের ভিতর আলোর গতি সিকি-পরিমাণ কমে যায়; কাচের ভিতর কমে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। আবহাওয়া অর্থাৎ বাতাসে সেটা এত কম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় যা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আরও মজার কথা—স্বচ্ছ কাচ বা জলের ভিতর আলোর-তরঙ্গের গতিবেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও দেখা যাচ্ছে ঐ মাধ্যম ভেদ করে বাতাসে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আলোক-তরঙ্গ আবার তার গতিবেগ—সেই সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার গতি—আপনা থেকেই ফিরে পাচ্ছে। তা থেকে এটুকু বোঝা গেল যে, মাধ্যমের গুণাগুণের উপর আলোর গতি নির্ভর করছে। স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে—মহাশূন্যে, যেখানে বাতাস নেই সেখানে আলোর গমনাগমনের মাধ্যম কী?

আলো যখন তরঙ্গভঙ্গি এগিয়ে চলে, তখন তার একটা ‘মাধ্যম’ চাই বইকি। জলে ঢেউ চলে জল আছে বলে, শব্দতরঙ্গ বাতাসে ভেসে চলে বাতাস আছে বলে—বাতাস যেখানে নেই শব্দতরঙ্গ সেখানে এগিয়ে যেতে পারে না, জল ছাড়া ঢেউ যেমন কল্পনা করা যায় না। তাহলে ঐ যে মহাশূন্যের ও-প্রান্ত থেকে সূর্যের আলো, নক্ষত্রের আলো, নক্ষত্রের গ্রহ উপগ্রহের প্রতিফলিত আলো ভেসে আসছে তারও একটা মাধ্যম চাই। শুধু আলোই বা কেন—১৮৬৪ সালে ম্যাক্সওয়েল প্রমাণ করলেন বিদ্যুৎও এক জাতের তরঙ্গ। ক্রমে প্রমাণিত হল বেগুনী-পারের আলো, লাল-উজানী আলো, গামা রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি সবই তরঙ্গ-ধর্মী। সকলেরই মহাশূন্য পাড়ি দিতে একটা মাধ্যমের প্রয়োজন। বাধ্য হয়ে এই সব তরঙ্গভঙ্গির জন্য একটা মাধ্যম কল্পিত হল। মেনে নেওয়া হল, মহাশূন্যে আছে এক মাধ্যম, তার নাম—‘ঈথার’!

কল্পনা করা হল, ঐ ঈথারের ওজন নেই, আকার নেই, কোন গুণ নেই—আছে

শুধু অস্তিত্ব।

অস্তিত্বের প্রমাণ ছাড়াই যুক্তির খাতিরে বিশ্ব-বিজ্ঞান এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হল।

ঈথারের অস্তিত্বের প্রমাণ : কিন্তু বিজ্ঞান যে প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে? ফলে এক জাতের পদার্থ-বিজ্ঞানী উঠে পড়ে লাগলেন ঈথারের বাস্তব-অস্তিত্ব প্রমাণ করতে। দ্বিতীয় দল বললেন, কী দরকার বাপু? বাস্তব-অস্তিত্ব থাক না থাক, শুধু-অন্ধের খাতিরে ওটা মেনে নাও না কেন? $\sqrt{-1}$ (রুট-ওভার মাইনাস-ওয়ান)-এর তো বাস্তব-অস্তিত্ব নেই, তবু ওটা মেনে নিচ্ছি এজন্য যে, ওটা মেনে নিলে অন্ধ কষতে সুবিধা হয়। ‘রুট-ওভার মাইনাস-ওয়ান’ কী, তা বোঝাতে গেলে বিস্তর অন্ধ কষতে হবে; তার চেয়ে একটা সহজ উদাহরণ দিই তাহলেই বুঝবে ঐ অবাস্তব $\sqrt{-1}$ -এর বাস্তব-অস্তিত্ব ছাড়াই কী ভাবে শক্ত শক্ত অন্ধ কষে ফেলা যায় :

এক বেদুইন-সর্দার মৃত্যুকালে উইল করে গেল যে, তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে বড় ছেলে, এক চতুর্থাংশ মেজ ছেলে এবং এক-পঞ্চমাংশ ছোট ছেলে। তিন পুত্র শ্রাদ্ধান্তে গুনে দেখল বাবা রেখে গেছেন উনিশটি উট। বোঝা বখেড়া! উনিশটি উট কী ভাবে অর্ধেক করা যাবে? কিম্বা চার অথবা পাঁচ ভাগ! বাধ্য হয়ে তারা তিন ভাই হাজির হল কাজীর কাছে। কাজী বললে, এ তো সহজ হিসাব! আমার আস্তাবল থেকে একটা উট নিয়ে এসে ওটাকে কুড়িতে পরিণত করলেই লেঠা চুকে যাবে। তিন ভাই হাঁ-হাঁ করে ওঠে। প্রতিগ্রহ তারা নেবে কেন? কাজী বললে, বাপু-হে, তোমরা ব্যস্ত হয়ে না। আমি দানখয়রাত করতে বসিনি—অন্ধের হিসাবটা শুধু বুঝিয়ে দিচ্ছি। শোন। আমার উটটা যোগ করায় এখন উটের মোট সংখ্যা হল কুড়ি, কেমন তো? এবার বড় ছেলে তার অর্ধেক নাও—দশটি। মেজ ছেলে কুড়ির এক চতুর্থাংশ—পাঁচটি; ছোট ছেলে এক পঞ্চমাংশ—চারটি। যোগ করে কত হল? দশ + পাঁচ + চার = একুনে উনিশ। আমার ফালতু উট এবার আমার আস্তাবলে ফিরে যাক।

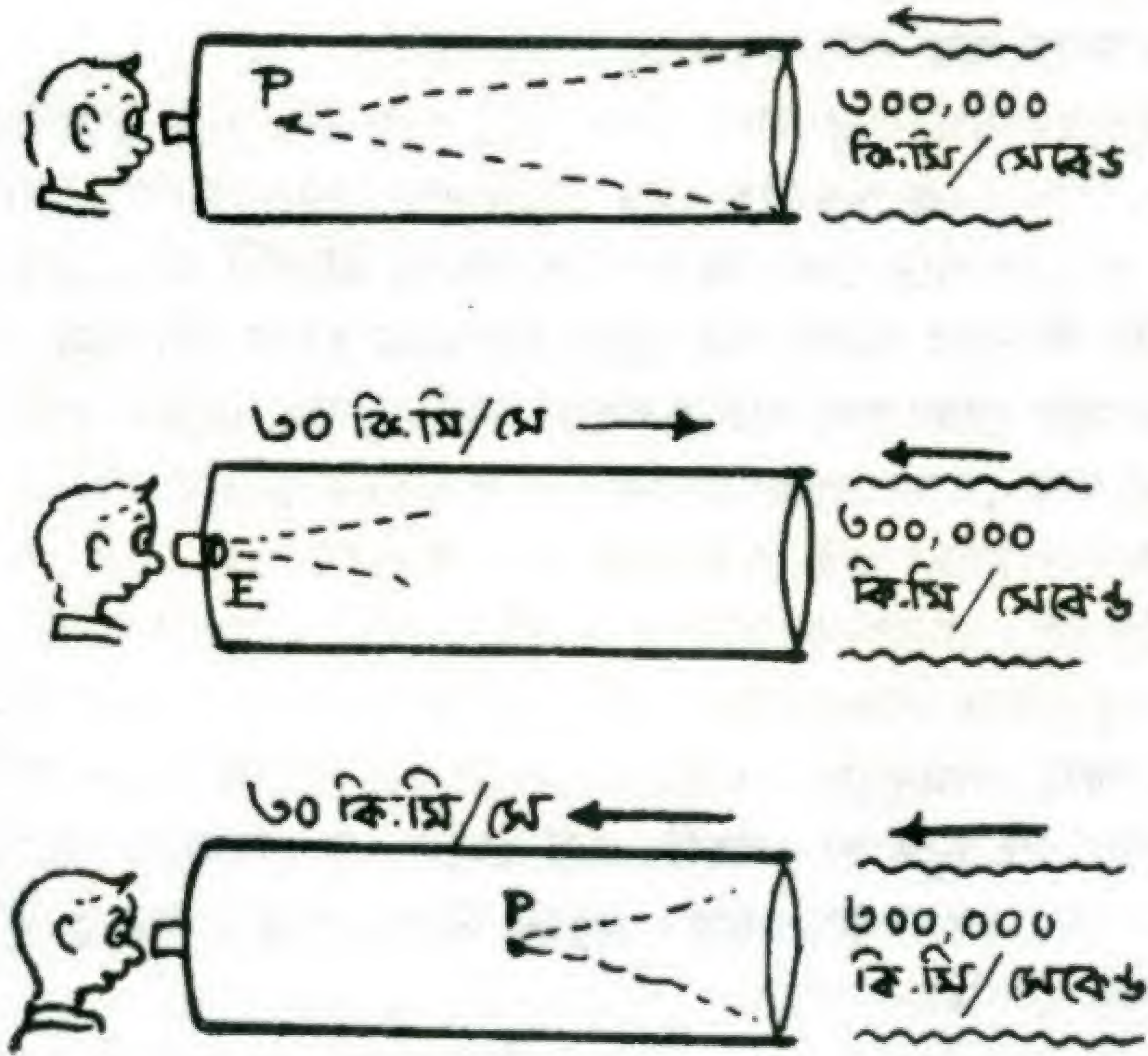
অন্ধে যাঁরা দড় তাঁরা বলবেন—হিসাবে ফাঁক আছে। তা থাক, তিন ছেলে তো ঐ নিয়ে ঝগড়া-কাজিয়া করল না। পিতৃদত্ত উট কেটে খণ্ড খণ্ড করতে হল না—তাই বা কম কি?

$\sqrt{-1}$ হচ্ছে অন্ধশাস্ত্রে ঐ কাজীর ফালতু উটের মতো। বাস্তবে তাকে আস্তাবল থেকে না আনলেও খাতা-কলমে অন্ধটা কষে কাজী-সাহেব হিসাব মেলাতে পারতেন। দ্বিতীয় দলের বৈজ্ঞানিকরা বললেন, ‘ঈথার’টাকেও ঐ $\sqrt{-1}$ অথবা কাজীর অনুপস্থিত উটের মতো মেনে নাও না বাপু অন্ধের খাতিরে।

কিন্তু প্রথম দলের বিজ্ঞানীরা তা মানতে রাজী নন।

তাঁরা বললেন, ঈথার যদি থাকে, তবে মেনে নিতে হবে ঈথার-সমুদ্রে গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকা, আলো, বেতার-তরঙ্গ, মহাজাগতিক রশ্মি প্রভৃতি ভেসে বেড়াচ্ছে বটে কিন্তু ঈথার আছে অচল-অনড়। অ্যাকোয়ারিয়ামে যেমন মাছ ভেসে

বেড়ায়, জল থাকে অনড়; কিন্তু নিস্তরঙ্গ হুদে যেমন নৌকা ভেসে চলে ঢেউয়ের তালে তালে কিন্তু হুদের জল থাকে অচল। কিন্তু নিস্তরঙ্গ হুদে নৌকা এগিয়ে চলেছে না স্থির তা তো আমরা বুঝতে পারি নৌকা থেকে হাত বাড়িয়ে, জলে হাত ডুবালেই। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন—ঠিক তেমন ভাবে ঈথার সমুদ্রে হাত ডুবিয়ে কি বোঝা যাবে না যে, নিস্তরঙ্গ ঈথারের ভিতর দিয়ে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে? বাতাস স্থির, তবু নৌকা যদি পূর্ব-মুখো যায় তবে পালটা পশ্চিম দিকে ফুলে ওঠে; তেমনি নিস্তরঙ্গ ঈথারের ভিতর দিয়ে পৃথিবী যখন এগিয়ে চলেছে তখন পরীক্ষা করলে নিশ্চয় বোঝা যাবে ঈথারের বিপরীতমুখী প্রবাহ। ঐ ঈথার প্রবাহটা যদি ধরা পড়ে তবে বোঝা যাবে ঈথার-সমুদ্রে পৃথিবী সূর্য-প্রদক্ষিণ করছে—তার চেয়ে বড় কথা প্রমাণ হবে ঈথারের অস্তিত্ব। এই জাতের একটি পরীক্ষার কথা এবারে বলি :



চিত্র—১২

চিত্র—১১ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে পৃথিবী ছয় মাস আগে-পিছে বিপরীত মুখে অগ্রসর হয়। মনে করা যাক ১লা জানুয়ারি তারিখে আমরা টেলিস্কোপে একটা নক্ষত্রকে ‘ফোকাস’ করলাম। তখন পৃথিবীর গতিমুখ ঐ নক্ষত্রের দিকে। আমরা জানি, সূর্য-প্রদক্ষিণ-পথে পৃথিবীর গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩০ কি. মি.। প্রথমে ধরা যাক পৃথিবী স্থির আছে; নক্ষত্র থেকে আলোক-তরঙ্গ সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার বেগে দূরবীনের লেন্সে এসে পড়ছে এবং ‘p’ বিন্দুতে ফোকাস হচ্ছে (চিত্র—১২/উপরে); অর্থাৎ প্রতিবিম্ব রচনা করছে। যেহেতু ‘p’ বিন্দুটা দূরবীনের অনেকটা মাঝামাঝি, আইপিসের অনেক সামনে, তাই দর্শক সেই

প্রতিবিম্বটা দেখতে পাবে না। এবার মনে করি, পৃথিবী সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার বেগে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। এবার অর্থাৎ দ্বিতীয় অবস্থায় প্রতিবিম্বটা আইপিসের (E-চিহ্নিত) উপর পড়বে। দর্শক ঠিকমতো দেখতে পাবে। মনে করা যাক, ঐ দ্বিতীয় অবস্থায় পয়লা জানুয়ারি যন্ত্রটাকে সাবধানে সীলমোহর করে রাখলাম। তারপর ছয় মাস পরে, ১লা জুলাই যদি আমরা ঐ দূরবীনে নক্ষত্রটাকে দেখতে চাই তাহলে সেটা ‘আউট-অফ-ফোকাস’ হয়ে যাবার কথা। কারণ এবার তৃতীয় অবস্থায় পৃথিবী উল্টো দিকে চলেছে, অর্থাৎ আলোর গতিমুখের দিকে চলেছে! আইনমোতাবেক তাই হওয়ার কথা; বাস্তবে কিন্তু বার বার পরীক্ষা করেও এমনটি ঘটতে দেখা গেল না। ব্যাপার কি? কেন এমনটা হচ্ছে?

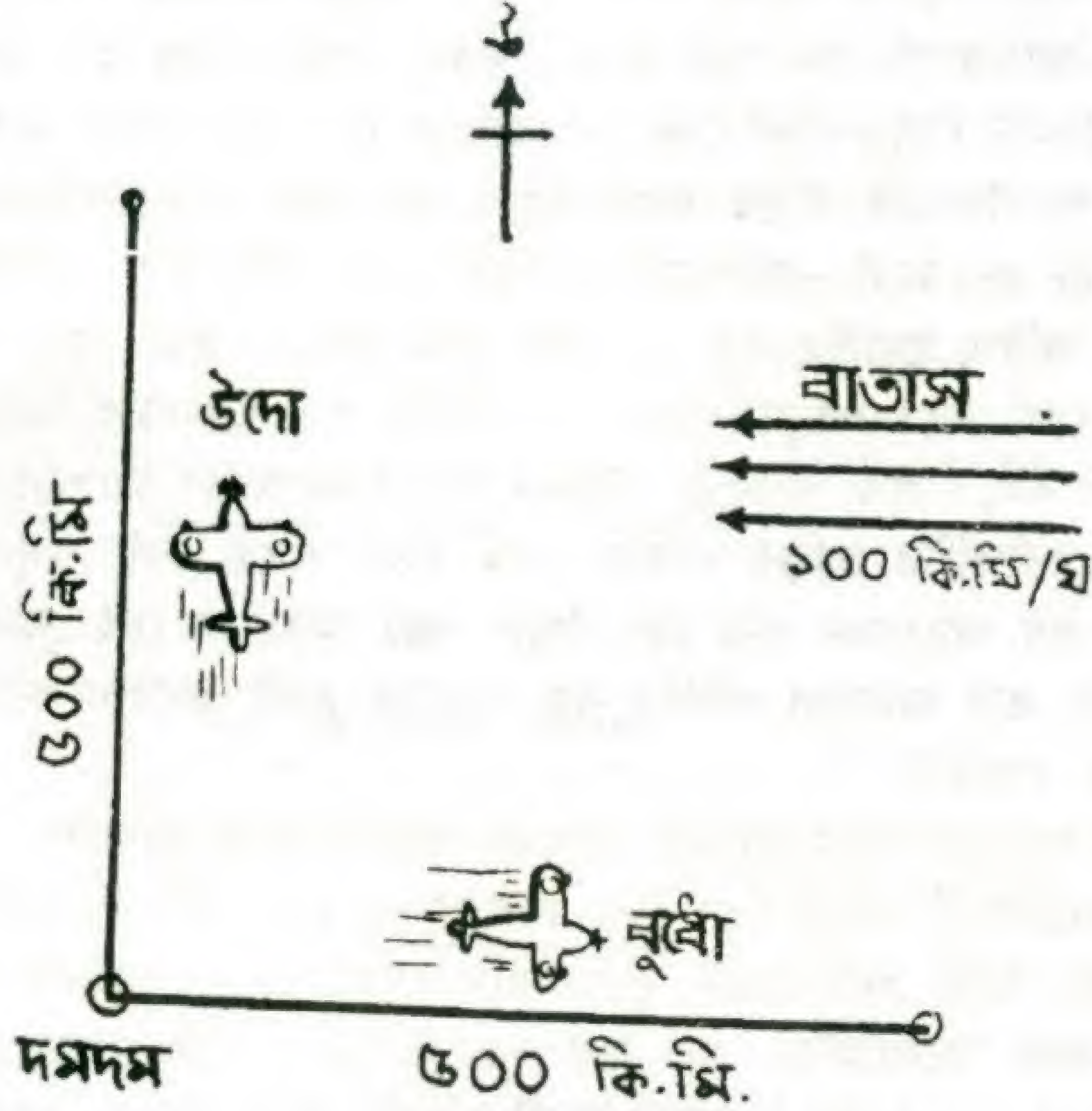
এর পর ঈথারের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে আর এক জাতের পরীক্ষা করলেন মাইকেলসন এবং মর্লে—যৌথভাবে। ঘটনাটা ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের। সে পরীক্ষাতেও ঈথারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হল না—কিন্তু কেন হল না, তার কোন যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যাও কেউ দিতে পারেনি তখন। পরীক্ষাটির কথা আমাদের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে হবে, কারণ ঐ পরীক্ষার আপাত-অসঙ্গতিই আপেক্ষিকতাবাদের ভগীরথ। পরীক্ষাটির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় নেমে পড়ার আগে একটা অনুরূপ বাস্তব পরীক্ষার কথা আলোচনা করি বরং। ঈথার বস্তুটা আছে কি নেই সেটাই এখনো স্থির হয়নি, তাই আমাদের পরিচিত বস্তু ‘বাতাসে’ একটা অনুরূপ পরীক্ষা আগে করে হাত পাকাই :

উদো আর বুধো দুই যমজ ভাই। দুজনেই পাইলট। একই রকম দক্ষ বৈজ্ঞানিক। একই মডেলের দুটি বিমান নিয়ে ঠিক একই সময়ে তারা দমদম বিমানঘাঁটি থেকে রওনা হল। উদো গেল উত্তরে, বুধো সিধে পূর্বে। তাদের দুজনের গতিবেগই ঘণ্টায় হাজার কিলোমিটার। ধরা যাক দুজনেই ৫০০ কিমি সোজা গেল এবং সোজা ফিরে এল। অঙ্কের হিসাবে ওরা ঠিক একই মুহূর্তে দমদমে ফিরে আসবে। কারণ দুজনেই যাতায়াতে হাজার কিমি পথ অতিক্রম করেছে, সময় নিয়েছে এক ঘণ্টা। এবার মনে করা যাক, ঐ সময় পূবালী ঝড় বইছিল ঘণ্টায় ১০০ কিমি বেগে। তাহলে কী হবে? ঠিক একই মুহূর্তে তারা ফিরে আসবে কি? না, তা আসবে না। দেখা যাবে পাশের থেকে চাপ থাকায় উদোকে যতটা বেগ পেতে হচ্ছে তার চেয়ে বুধোকে বেশি ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। ফলে বুধোর সময় কিছু বেশি লাগবে। এক ঘণ্টা পার হয়ে যাবার পরেও বুধোর ৩৬ সেকেন্ড বেশি সময় লাগবে, উদোর ১৮ সেকেন্ড।

যাবার সময় বুধোর গতিবেগ ছিল $(১০০০-১০০) = ৯০০$ কিমি প্রতি ঘণ্টায়। ঐ গতিতে ৫০০ কিমি পথ অতিক্রম করতে তার সময় লেগেছে $৫০০ \div ৯০০ = \frac{৫}{৯}$ ঘণ্টা = ৩৩ $\frac{১}{৩}$ মিনিট। তেমনি ফেরার সময় বুধোর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় $(১০০০+১০০) = ১১০০$ কিমি। ঐ গতিতে ফেরার পথে তার সময় লেগেছে $৫০০ \div ১১০০ = ২৭.২৭$ মিনিট। যোগ করলে দাঁড়াচ্ছে $৩৩.৩৩ + ২৭.২৭ = ৬০.৬০$ মিনিট = ১ ঘণ্টা ৩৬ সেকেন্ড। উদোর ক্ষেত্রে অঙ্কটা কিছু জটিল—সেটা বরং

মেনেই নেওয়া যাক। মোট কথা বলতে পারি, আমরা যদি বায়ুর গতিবেগ না জানতুম অথচ ঘড়িতে দেখতুম উদো ফিরছে ১৮ সেকেন্ড দেড়িতে আর বুধো ৩৬ সেকেন্ড দেড়ি করে, তবে বলতে পারতুম সেই অজ্ঞাত বায়ুবেগ ছিল ঘণ্টায় ১০০ কিমি।

এবার আমাদের পক্ষে মাইকেলসন, মর্লে-র পরীক্ষাটা বুঝে নেওয়া সহজ হবে। উদো-বুধোর বদলে এবার রেস লড়বে এক যমজ আলোকরশ্মি। বাতাসের



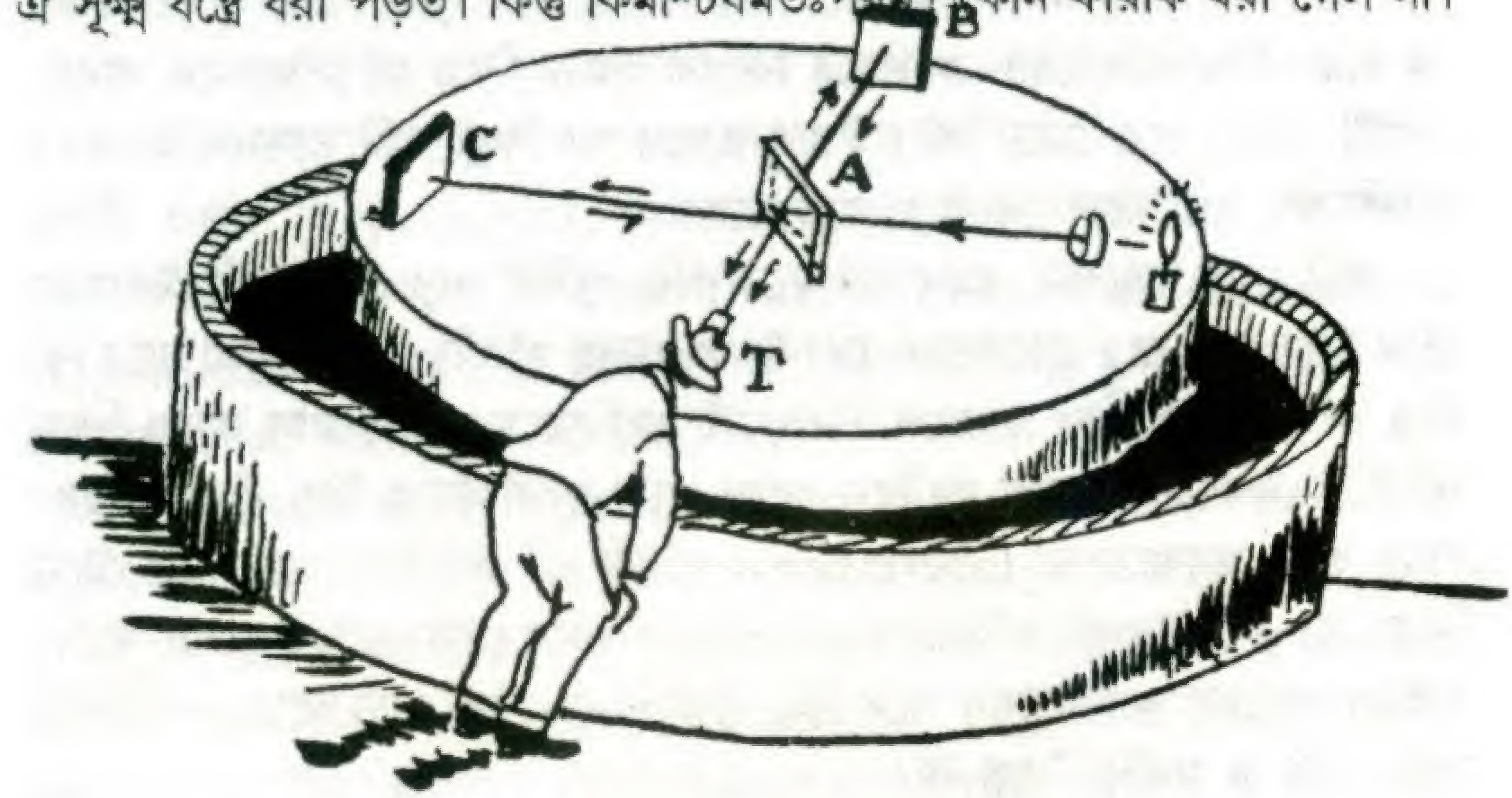
চিত্র-১৭

বদলে এবার মাপতে হবে 'ঈথারের প্রবাহ'।

মাইকেলসন-মর্লের যন্ত্রটির নাম 'ইন্টারফেরোমিটার'। উনি স্থির করলেন একটি আলোকগুচ্ছকে (beam of light) দু ভাগে ভাগ করে দু দিকে পাঠাবেন। চিত্র-১৪-তে আলোকগুচ্ছ উৎস থেকে রওনা হয়ে A চিহ্নিত কাচের উপর বসে পড়ল। ঐ A কাচটা অর্ধেক আয়না, অর্ধেক স্বচ্ছ কাচ। ফলে অর্ধগুচ্ছ আলো চলে গেল C চিহ্নিত দর্পণের দিকে স্বচ্ছ কাঁচ ভেদ করে, এবং বাকি অর্ধেক চলে গেল B চিহ্নিত দর্পণের দিকে! দুটি আলোকগুচ্ছই যথারীতি দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এল কেন্দ্রস্থ A-তে। এবার প্রথম গুচ্ছটি A দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে পৌঁছালো T-তে; দ্বিতীয় আলোকগুচ্ছও ফিরে এল T-তে। T বস্তুত একটি টেলিস্কোপ।

আমাদের উদো-বুধোর ক্ষেত্রে এয়ারোপ্লেনের গতিবেগ আর বাতাসের গতিবেগে বিশেষ ফারাক ছিল না। উড়োজাহাজ যাচ্ছিল ঘণ্টায় হাজার কিমি, বাতাস একশ

কিমি। অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এবার আলোর গতি প্রতি-সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার এবং ঈথার-তরঙ্গের আপেক্ষিকে পৃথিবীর গতি মাত্র ৩০ কিলোমিটার—যেহেতু পৃথিবী ঐ গতিতে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে। তা হোক, যন্ত্রটা এতই নিখুঁত যে, এক্ষেত্রে আলোক তরঙ্গদ্বয়ের নিজ নিজ পথ অতিক্রম করতে হিসাবমতো যতটুকু সময়ের পার্থক্য হবার কথা তা ইন্টারফেরোমিটারে ধরা পড়বে। আলোর গতিবেগ যদি মাত্র একশ মিটার পরিমাণ কমে যেত তাহলেও ঐ সূক্ষ্ম যন্ত্রে ধরা পড়ত। কিন্তু কিম্বাচর্যমতঃপরম! কোন ফারাক ধরা গেল না।



চিত্র-১৪

যন্ত্রটাকে নানা দিকে ঘুরিয়ে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে বারে বারে পরখ করে দেখা গেল, সামান্যতম হেরফেরও ধরা পড়ছে না। আলো-উদো এবং আলো-বুধো প্রতিবারই ঠিক এক সময়ে ফিরে আসছে—ঈথার-সমুদ্রে পৃথিবী কোন্ মুখে চলেছে তার তোয়াক্কা না করে!

বিজ্ঞানীরা মহা ফাঁপরে পড়লেন। তাঁদের সামনে তখন দুটি বিকল্প পথ : হয় মেনে নাও ঈথার বলে কিছু নেই! তার মানে, ইতিপূর্বে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ, আলো, মহাজাগতিক রশ্মি ইত্যাদি বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে তা ছেঁড়া-কাগজ ফেলার বুড়িতে ফেল! না-হলে কোপার্নিকাস্-এর সিদ্ধান্তটা বাতিল করে বল—পৃথিবী স্থির, সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রের দল পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। অনেক পদার্থবিদ বললেন, এই দ্বিতীয় মতটাই মেনে নেওয়া বরং সহজ—কারণ ঈথার নেই অথচ মহাকাশ পাড়ি দিয়ে আলো আসছে—এটা ভাবাই যায় না!

ওঁদের চিন্তাধারা আর একটু খতিয়ে দেখা যাক বরং :

মাইকেলসন-মর্লের পরীক্ষা ব্যর্থ হল কেন? ঈথারের অস্তিত্ব ঐ পরীক্ষায় কেন ধরা পড়ল না এ নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে নানান জল্পনা শুরু হল—সেকথা আগেই বলেছি। যদি ধরে নেওয়া যায়—ঈথার আদৌ নেই তাহলে অবশ্য একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু ঈথারের অস্তিত্ব বিষয়ে বিজ্ঞানীরা তখন এতই

স্থির-বিশ্বাসী যে, সে মতটা মেনে নেওয়া চলে না—মেনে নিলে যে আবার নতুন জাতের সমস্যা দেখা দেয় : আলোক-তরঙ্গের মাধ্যম তাহলে পাব কোথায়?

অনেক বিবেচনা করে বিজ্ঞানীরা ঐ পরীক্ষার ব্যর্থতার হেতু হিসাবে চার জাতের ব্যাখ্যা দাখিল করলেন। প্রথম মতটা সরল : মেনে নাও পৃথিবী ঈথারের ভিতর স্থির আছে, আর যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকা ঈথার-তরঙ্গে ভেসে চলেছে। তাহলে ব্যর্থতার একটা যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় বটে, কিন্তু এ যেন সেই প্রাক্-কোপারনিকাস যুগে ফিরে যাওয়া! আসলে পৃথিবী তো সূর্যের একটি গ্রহ মাত্র—বিশ্ব-ব্যাপারের কেন্দ্রস্থলে বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে সে সিংহাসনে আরুঢ়, —এটা কেমন করে মেনে নিই? ঈথার-তরঙ্গে সব কিছুই যদি ভাসমান হয় তবে পৃথিবীকেও দুর্গা বলে ভেসে পড়তে হবে।

কেউ কেউ বললেন, এমন যদি মনে করি, পৃথিবী তার চতুষ্পার্শ্বস্থ ঈথারকে টেনে নিয়ে চলেছে? সেক্ষেত্রেও তো ঈথার-প্রবাহ পৃথিবী থেকে বোঝা যাবে না, কিন্তু ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ব্র্যাডলে ইতিপূর্বেই দেখিয়েছেন—ছয় মাস আগে-পিছে পৃথিবীকে নক্ষত্রের আলো দূরবীনে ধরতে হলে দূরবীনটাকে কিছু বাঁকাতে হয়। যাকে বলে ‘অ্যাবারেশন’ (aberration)। পৃথিবী যদি ঈথারকে তার সাথে টেনে নিয়ে যেত—মোটরগাড়ির ভিতরকার বাতাস যে-ভাবে মোটরগাড়ির সঙ্গেই ছোটে, তাহলে নক্ষত্রের ‘অ্যাবারেশন’ বলে কিছু থাকতো না। কিন্তু সেটা আছে—পরীক্ষিত সত্য; তাই ও মতটা টিকল না।

তৃতীয় মতাবলম্বীরা বললেন, ধর যদি এমন হয়, ইন্টারফেরোমিটার যন্ত্রটা ঈথার-সমুদ্রে পৃথিবীর সঙ্গে যদিকে যত জোরেই ভেসে চলুক আলোর গতি সেই যন্ত্রের আপেক্ষিকে সর্বদাই অপরিবর্তিত থাকবে। তা যদি মানি, তবে মেনে নিতে হয়, ঈথার-তরঙ্গের সঙ্গে আলোর গতি হবে এক-এক সময় এক-এক রকম। উদো-বুধোর রেসের সঙ্গে তুলনা করে বলতে হয়—বাতাস যত জোরে যদিক থেকেই বইতে থাক দুই বৈমানিকের গতিবেগ কখনও হের ফের হবে না। এই ব্যাখ্যা মেনে নিলেও পরীক্ষার ব্যর্থতার একটা হদিস মেলে কিন্তু এর চেয়ে যে ‘ঈথার নেই’ মেনে নেওয়াই ভালো ছিল। কারণ ‘ঈথার’কে যে কল্পনা করা হয়েছিল আলোর মাধ্যম হিসাবে—মাধ্যমের ধর্ম হচ্ছে তার সঙ্গে তরঙ্গের গতিবেগের কোন হেরফের হবে না। শব্দ তরঙ্গের উদাহরণটা বিবেচনা করে দেখুন না কেন? শব্দ-তরঙ্গের গতিবেগ তো উৎসের গতি-নিরপেক্ষ। উৎসমুখ যদিকেই থাক, যত জোরেই থাক, শব্দ-তরঙ্গের গতিবেগের কোন হেরফের হবে না। রেল ইঞ্জিন স্টেশনের দিকে এগিয়েই আসুক অথবা পিছিয়েই যাক তার সিটির শব্দ একই বেগে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে—শব্দের তীক্ষ্ণতা (pitch) বাড়তে পারে, গতিবেগ নয়। বাস্তবিকপক্ষে আলোর ক্ষেত্রেও যে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে তার প্রমাণ মেলে একটি বিশেষ-জাতের নক্ষত্রের দিকে তাকালে। যাকে বলি যুগ্মতারকা; যেমন আমাদের আকাশের সব চেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র লুব্ধক। ঐ নক্ষত্র আসলে এক জোড়া নক্ষত্র—তারা যেন হাত-ধরাধরি করে পাক খাচ্ছে। একটা ডান্বেল পাক খেতে

খেতে আকাশে ঘুরলে যেমন হয়। এক্ষেত্রে ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্র-যুগলের একটি যখন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে তখন দ্বিতীয়টি আমাদের কাছ থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। ঐ তিন নম্বর ব্যাখ্যাটা যদি মেনে নিই—অর্থাৎ ধরে নিই আলোর গতি নির্ভর করছে তার উৎসের গতির উপর, তাহলে আমরা সেই আইনটা ঐ যুগ্মতারকায় প্রতিফলিত হতে দেখতাম—যে নক্ষত্রটি এগিয়ে আসছে তার গতিবেগ বেশি বলে মনে হত, যেটি পিছিয়ে যাচ্ছে সেটির চেয়ে। বাস্তবে তা আমরা দেখতে পেলুম না। অর্থাৎ তিন নম্বর যুক্তিটা ধোপে টিকল না।

এবার চতুর্থ যুক্তি। সেটা পেশ করলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে, বস্তুত ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে, ফিট্জেরাল্ড এবং লরেন্জ। প্রমাণ দিতে পারলেন না, দিলেন একটি প্রকল্প (hypothesis); অর্থাৎ সম্ভাব্য যুক্তি। থিওরিটার নাম ‘ফিট্জেরাল্ড-লরেন্জ-সঙ্কোচন প্রকল্প’ (Fitzgerald-Lorentz Contraction Hypothesis)। যেহেতু সেটি আমাদের আপেক্ষিকতাতত্ত্বের দু নম্বর ভগীরথ তাই সেটাকে ভালো ভাবে বুঝে নিতে হবে।

ফিট্জেরাল্ড-লরেন্জ সঙ্কোচন: এই মতের মূল তত্ত্বটা হল—ঈথারসমুদ্রে প্রতিটি বস্তু গতিমুখের দিকে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। না হবে কেন? রবারের বল যখন দেওয়ালে আহত হয় তখন সে চেপ্টে যায়, গোল টম্যাটো মেঝেতে পড়ে খেঁতলে যায়। ঠিক তেমনি ভাবে—ওঁরা বললেন, ঈথারের প্রত্যাঘাতে প্রতিটি বেগবান বস্তু গতিমুখের দিকে কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। এটা যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে মাইকেলসন-মর্লের ব্যর্থতার কারণটাও খুঁজে পাব। কারণ এখন বলতে পারা যাবে যে, ইন্টারফেরোমিটার যন্ত্রের চোঙটা ঈথারের প্রতিবন্ধকতা ভেদ করে এগিয়ে যাবার সময় কিছুটা সঙ্কুচিত হয়েছে বলেই এমনি ঘটেছে। উদো-বুধোর রেসের উদাহরণ নিয়ে এবার বলব—বাতাসের প্রতিবন্ধকতায় ওদের গন্তব্যস্থলের দূরত্বটাই এমন ভাবে সঙ্কুচিত হয়ে গেল—যাতে দুজনে একই সময়ে ফিরে আসবে। ফিট্জেরাল্ড অঙ্ক কষে গতির সঙ্গে সঙ্কোচনের ঐ পরিমাণটা মেপে একটা ফর্মুলা দাখিল করলেন; অর্থাৎ কতটা বেগে গেলে কতটা সঙ্কুচিত হবে। উনি আরও বললেন, এই সঙ্কোচন চলমান বস্তুর কাঠিন্যের উপর মোটেই নির্ভর করবে না—লোহা, কাঠ ও রবার এই কারণে একই ভাবে সঙ্কুচিত হবে—তার পরিমাণটা নির্ভর করবে শুধুমাত্র তার গতিবেগের উপর।

প্রশ্ন হতে পারে—থিওরি কেন, সঙ্কুচিত হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা মেপে দেখলেই হবে। বাস্তবে তা সম্ভবপর নয়। কারণ থিওরি অনুযায়ী ফুটরুলটাও যে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে—মেপে ফারাকটা বার করব কেমন করে? এ যেন বলা—চোখ বুজলে আয়নায় তোমার মুখখানা বাঁদরের মতো দেখতে লাগে। অপ্রমাণ করবে কি করে?

ব্যাপারটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগছে না? লোহা আর রবার একই রকমভাবে সঙ্কুচিত হবে? কেন? না, যেহেতু ঈথার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে—যে ঈথারের না আছে ওজন, না আকার, না কোনও কাঠিন্য। যেহেতু মেপে দেখাতে পারছি

না তাই ঐ অদ্ভুত যুক্তিটা মেনে নিতে হবে? চোখ বন্ধ অবস্থায় আমার প্রতিবিশ্ব যে জীব-বিশেষের মতো আয়নায় দেখা যায় না এটা দেখতে পারছি না বলেই মেনে নেব?

কিন্তু না মেনে নিলে মাইকেলসন-মর্লের পরীক্ষার ব্যর্থতাটা ব্যাখ্যা করব কেমন করে?

বস্তুত গত শতাব্দীতে ঐ ‘ফিট্জেরাল্ড-লরেন্জ-সঙ্কোচন’ থিওরিটা কেউ প্রমাণও করতে পারেনি, অপ্রমাণও নয়।

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হল সমস্যাটা অমীমাংসিত অবস্থাতেই। বিজ্ঞানীরা ঈথারের অস্তিত্ব তখনও মেনে নিতে ইচ্ছুক—যদিও তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আর কেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল না তার কোনও সন্তোষজনক জবাব নেই। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? ঈথার আছে, না নেই? যদি থাকে, তবে কোন ভাবেই তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হচ্ছে না কেন? যদি না থাকে—তবে আলো এবং অন্যান্য ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের মাধ্যম কী?

এজাতীয় সমস্যার সমাধান নাকি করতে পারতেন পরশুরামের মৃত্যুঞ্জয়ী চরিত্র মহেশবাবু। তিনি নাকি অঙ্ক কষে প্রমাণ করেছিলেন $\text{ঈশ্বর}=0$; $\text{আত্মা}=0$; $\text{ভূত}=\sqrt{0}$ । ঈথারের অস্তিত্ব নিয়ে তিনি কোন পরীক্ষা করেছেন বলে জানি না।

এভাবেই গত শতাব্দীর শেষ হল। সমাধান পাওয়া গেল বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমেই। পরশুরাম রসিকতা করে যা বলেছেন প্রায় সেই জাতীয় জিনিসই বাস্তবে ঘটল। এক ভদ্রলোক হাতির শুড়ের মতো চিহ্ন এঁকে স্রেফ অঙ্ক কষে সমস্যাটার সমাধান করে দিলেন। ভদ্রলোকের নাম—প্রফেসর আলবার্ট আইনস্টাইন।

॥ দুই ॥

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মূলতত্ত্ব

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ-তত্ত্বের মূল সূত্রদ্বয় : আগেই বলেছি, আইনস্টাইনের আবিষ্কারকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। তার প্রথমটি হচ্ছে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ বা ‘স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি’। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, যে দুটি বস্তুর মধ্যে আপেক্ষিকতা মাপা হবে তারা অপরিবর্তিত গতিতে সরলরেখায় সঞ্চরণশীল। গতির যদি হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তবে তা তাঁর দ্বিতীয় থিওরির-অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ সেক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে দুটি বস্তুর গতি সরলরেখায় এবং আপেক্ষিক গতি অপরিবর্তিত। গতিবেগ সেখানে বাড়ছে বা কমছে, যাকে বলি ত্বরণ,—যেমন আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া কোনও বলের—সেখানে দ্বিতীয় থিওরিটা প্রযোজ্য হবে। শেষ থিওরিটা সর্ব-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সমন্বয় প্রচেষ্টা। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের দুটি মূল সূত্র। তার প্রথমটি হচ্ছে

সরল ভাষায়: ঈথারের অস্তিত্বটা কোনভাবেই প্রমাণ করা যাবে না। ‘কেন যাবে না’ সেটা আলোচনা করার আগে আসুন, আমরা দু-একটা উদাহরণ নিয়ে পরখ করি। মনে করুন, রেলগাড়িতে যেতে যেতে আপনার ঝিমুনি আসছিল। চট্কা ভাঙতেই জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন—একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি বিপরীত দিকে চলেছে। আপনার বগির স্প্রিং যদি ভালো থাকে তাহলে আপনি বলতে পারবেন না—কোন গাড়িটা যাচ্ছে আর কোনটা থেমে আছে। সেটা বুঝে নেবার একমাত্র উপায় হল জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কোন স্থির বস্তুকে পরখ করা—গাছ বা টেলিগ্রাফের পোস্ট। এবার মনে করুন, ঐ স্থির বস্তু আপনার কাছেপিঠে একটাও নেই—যেমন ধরুন, আপনি মহাকাশের যাত্রী; রকেটে চড়ে মঙ্গল গ্রহে চলেছেন। জানালা দিয়ে হয়তো চাঁদ, সূর্য, পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছেন—কিন্তু তারা তো কেউ স্থির নয়। এই সময়ে যদি আপনি জানালা দিয়ে দেখেন, আর একটি রকেট আপনার পিছন থেকে ক্রমশ এগিয়ে এসে আপনাকে অতিক্রম করে গেল, তাহলে নিজ গতিবেগ জানা না থাকলে আপনি বলতে পারবেন না তার গতিবেগ কত। মনে করুন, আপনি অঙ্ক কষে বার করলেন, সে প্রতি ঘণ্টায় আপনাকে এক হাজার কিলোমিটার ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বেশ, তাতেই বা কি? তার অসংখ্য বিকল্প সমাধান হতে পারে:

আপনার গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০০০ কিমি হলে ওর হচ্ছে ৬০০০ কিমি;

আপনার গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০০০ কিমি হলে ওর হচ্ছে ৭০০০ কিমি;

আপনি যদি মহাশূন্যে স্থির থাকতেন তবে ওর গতিবেগ ১০০০ কিমি;

এবং আপনি যদি ব্যাক-গিয়ারে ঘণ্টায় হাজার কিমি যান ও স্থির আছে।

তাহলে? বস্তুত কোন স্থির বস্তুর হৃদিস যতক্ষণ না পাচ্ছেন ততক্ষণ বলতে পারছেন না—কে কত জোরে বা কোন দিকে যাচ্ছে। এ থেকেই আইনস্টাইন বললেন সব গতিই আপেক্ষিক। ঐ থেকেই তত্ত্বটার নাম আপেক্ষিকতাবাদ। বস্তুত কোন বস্তুর নিজস্ব গতি বলে কিছু নেই, গতি মাত্রই আপেক্ষিক—কারও সঙ্গে তুলনামূলক বিচার মাত্র করা চলবে। কোন একটা বস্তুর গতি ‘এত’ এ-কথার কোনও মানে নেই—বলতে হবে অমুক বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে এই বস্তুর গতি ‘এত’। যেহেতু আমরা পৃথিবীতে বাস করি তাই ঐ মূল তত্ত্বটা খেয়াল করি না। আমরা যখন দেখি রেড রোডে নোটিশ ঝুলছে ‘ঘণ্টায় ৪০ কিমি গতিসীমা’ তখন বুঝে নিই সেটা পৃথিবীর কোন স্থির বস্তুর আপেক্ষিকে। কিন্তু পুলিশ কমিশনার সাহেব মহাশূন্যে ঐ নোটিশ টাঙালে তা নিরর্থক হবে—তাঁকে বলতে হবে কার আপেক্ষিকে ঐ সর্বোচ্চ গতিসীমা।

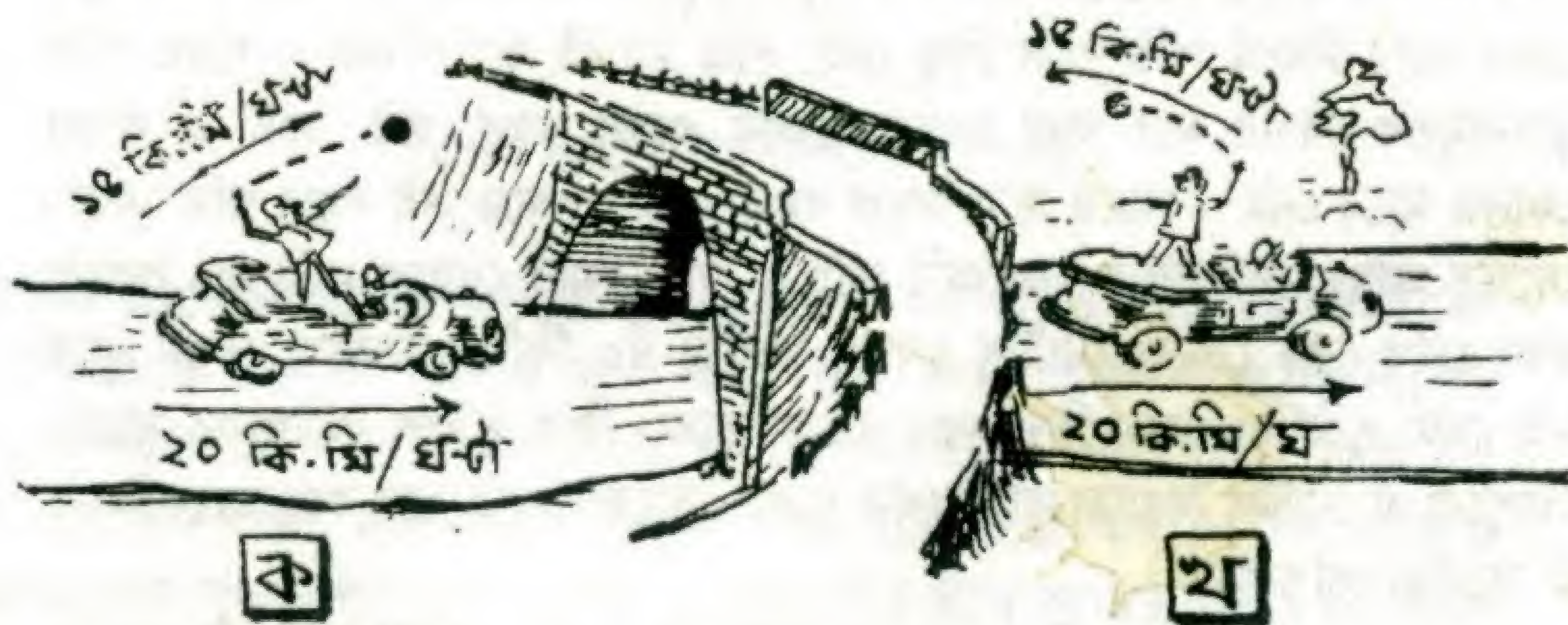
মজা হচ্ছে মহাশূন্যে স্থির বস্তু কোন কিছুই নেই। পৃথিবী দরবেশী নাচের ভঙ্গিতে নিজ অক্ষের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে; সূর্য এই গ্যালাকটিক-সিস্টেমে পাক খাচ্ছে; গোটা গ্যালাকটিক সিস্টেম আবার আবর্তিত হতে হতে একদিকে ছুটে চলেছে। সমস্ত বিশ্ব-প্রপঞ্চ গতির ছন্দে আবদ্ধ—কেউ স্থির নেই। বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু বলে কিছু নেই। কোন কিছুই গতিহীন হতে পারে না। সবাই চলেছে পরস্পরের সঙ্গে আপেক্ষিক বেগে। কিন্তু তা থেকে কেমন নক্ষত্রলোকের দেবতাত্ত্বা—৬

ভাবে প্রমাণিত হবে যে, ঈথারের অস্তিত্ব কিছুতেই প্রতিষ্ঠা করা যায় না? যাবে এইভাবে—ঈথার যদি থাকে এবং স্থির হয়ে থাকে তবে তা আমরা মেপে বার করতে পারব না—কারণ আমরা আপেক্ষিক গতিই শুধু মাপতে সক্ষম। নিউটন অনেক আগে বলেছিলেন, জাহাজটা এগিয়ে চলেছে না স্থির হয়ে আছে তা জাহাজের ভিতরে বসে কোন যন্ত্রের সাহায্যেই মেপে বলা যাবে না; শুধু নিউটনের সময়ে নয়, আজও বিজ্ঞান এমন কোন যন্ত্র বার করতে পারেনি যাতে বাইরের কোন সাহায্য না নিয়ে জাহাজের রুদ্ধদ্বার কেবিনে বসে তার গতিটা পরিমাপ করা যায়। অনুরূপভাবে বলব, ঈথার যদি আদৌ থাকে তবে তথাকথিত স্থির-ঈথার সমুদ্রে পৃথিবীর গতি আমরা মেপে বার করতে পারব না, কারণ আমরা যে ঐ পৃথিবীতেই বাস করছি। পৃথিবী নামক জাহাজের রুদ্ধদ্বার কেবিনে!

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো—আইনস্টাইন কিন্তু ঈথারের অস্তিত্ব স্বীকার বা অস্বীকার করেননি; শুধুমাত্র বলেছেন—থাকলেও তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব। তাঁর বিভিন্ন থিয়োরিতে ঈথার-প্রসঙ্গ আর ওঠেনি—সেটা আছে কি নেই সে কথাও যেন বাহ্য।

ওঁর দ্বিতীয় সূত্রটি হল আলোকের গতি পর্যবেক্ষকের গতির সঙ্গে সম্পর্ক বিমুক্ত। এই উক্তিটি আরও বিপ্লবাত্মক। এর ধাক্কাটা বোঝা যাবে একটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করলে :

মনে করুন—একটি ছেলে ঘণ্টায় পনেরো কিলোমিটার বেগে একটা ক্রিকেট বল ছুঁড়ল। তার অর্থ—বলটা ছেলেটিকে অতিক্রম করে যাবে ঘণ্টায় পনেরো কিলোমিটার দূরত্বে, তা সে দাঁড়িয়েই থাকুক অথবা গতিশীলই হোক। মনে করা যাক, এবার ছেলেটি একটা ছড়-খোলা গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে (চিত্র—১৫ ক-র ভঙ্গিতে) ঐভাবে বল ছুঁড়ল গাড়িটা যখন ঘণ্টায় ২০ কিমি বেগে ব্রীজের দিকে



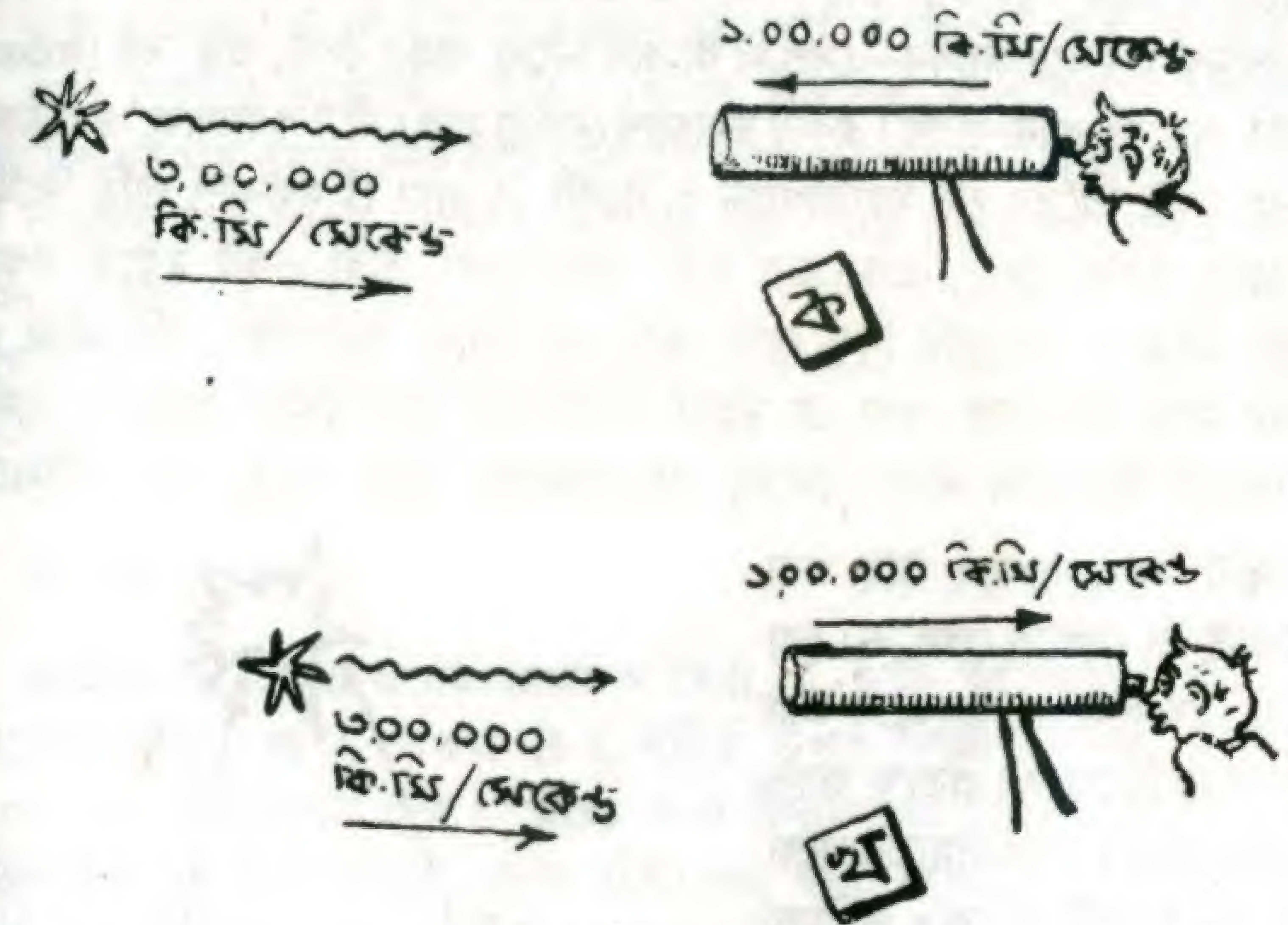
চিত্র—১৫

যাচ্ছে। তাহলে ছেলেটির আপেক্ষিক বলটার গতিবেগ ঘণ্টায় পনেরো কিমি হলেও সেটা ব্রীজের গায়ে গিয়ে আঘাত করবে $(১৫+২০) = ৩৫$ কিমি বেগে। কিন্তু যদি মনে করি, গাড়িটা ব্রীজ পার হয়ে যাবার পর ছেলেটি পিছন ফিরে বলটা

ছুঁড়ছে (চিত্র—১৫ খ) তখন বলটা ব্রীজের গায়ে গিয়ে আঘাত করবে $(১৫-২০) = -৫$ কিমি বেগে। তার মানে বলটা কোনদিনই ব্রীজের গায়ে গিয়ে আঘাত করবে না। গাড়ির পিছু পিছু ৫ কিমি বেগে ছুটতে থাকবে।

এবার আমরা ঐ ছেলেটির পরিবর্তে একটা নক্ষত্রকে কল্পনা করব, ব্রীজটা এক্ষেত্রে পৃথিবীতে অবস্থিত একটি দূরবীন এবং ক্রিকেট বলটি একটি আলোকতরঙ্গ। এক্ষেত্রে নক্ষত্রটা যেন ঐ আলোক-তরঙ্গটাকে সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিমি বেগে “ছুঁড়ে দিল”।

পূর্বোক্ত উদাহরণে ছেলেটির গতি ব্রীজের আপেক্ষিকে ছিল ঘণ্টায় ২০ কিমি—একবার এ-মুখো একবার ও-মুখো; এবারও আমরা কল্পনা করব নক্ষত্রের



চিত্র—১৬

আপেক্ষিকে পৃথিবীর গতি সেকেন্ডে ধরুন ১০০,০০০ কিমি একবার এ-মুখো একবার ও-মুখো—যেমন আঁকা হয়েছে চিত্র—১৬ ক ও খ-এ।

এবার দর্শকের আপেক্ষিকে আলোর গতিবেগ কত হবে? সোজা যোগ-বিয়োগের অঙ্ক—আপার গ্রেপ-এই কষেছি। ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। চিত্র—১৬/ক-তে $৩,০০,০০০ + ১,০০,০০০ = ৪,০০,০০০$ কিমি/সেকেন্ড এবং চিত্র—১৬ খ-র ক্ষেত্রে $৩,০০,০০০ - ১,০০,০০০ = ২,০০,০০০$ কিমি/সেকেন্ড। কেমন তো?

আমাদের নয়া কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ‘মিস’ ঘ্যাচ্ছোচ্ করে অঙ্ক দুটো কেটে দিলেন। কী ব্যাপার? দিদিমণি বললেন—এখনই কী শিখিয়েছি? আমার দ্বিতীয় সূত্র বলছে না—‘আলোর গতি পর্যবেক্ষকের গতির সঙ্গে সম্পর্কবিমুক্ত?’

এ কী অশাস্ত্রীয় কথা রে বাবা? সহজ যোগ-বিয়োগের অঙ্ক মানবে না? ‘দুয়ে দুয়ে চার হয়’ এ কথাটাও তর্ক করে উড়িয়ে দেবে নাকি? তাই দেবে। শিরাম চক্রবর্তীই বলেছেন, ‘দুয়ে দুয়ে চার হয়, আবার তেমন তেমন গরু পেলে দুয়ে দুয়ে

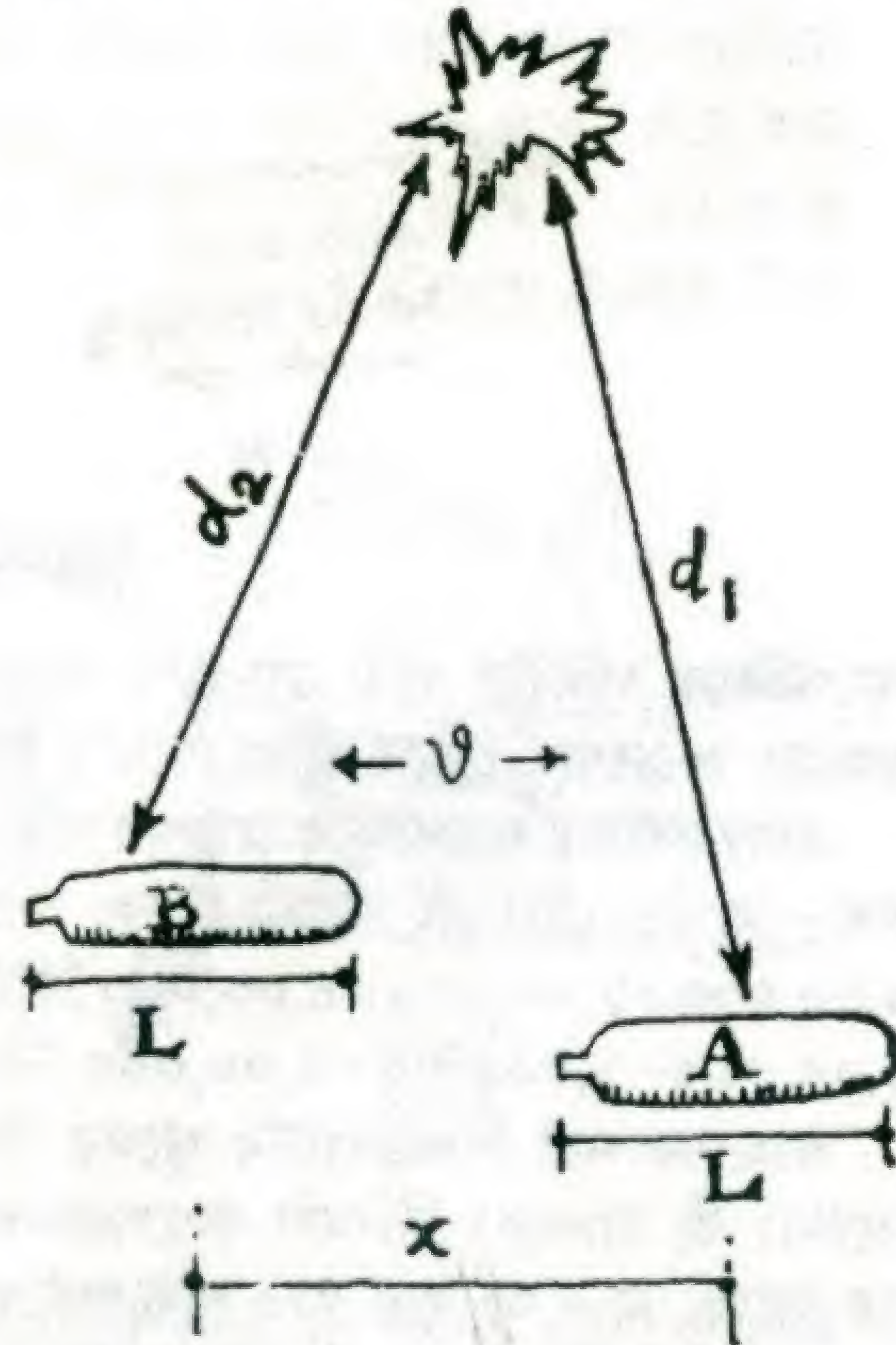
দুধও হয়!’ আইনস্টাইন তাঁর স্পেশাল থিয়োরিতে দুয়ে দুয়ে খাঁটি দুধই বানালেন! ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরিতে সেই দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন ক্ষীরও তৈরী করলেন। দল বেঁধে ফুচকা খেতে অভ্যস্ত তোমার-আমার পাকস্থলী যদি সে ক্ষীর হজম করতে না পারে তবে দোষ আমাদের পাকস্থলীর—এ খাঁটি ক্ষীরের নয়।

রসিকতা থাক; নিঃসন্দেহে আইনস্টাইনের এই দ্বিতীয় সূত্রটা বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারার জনক। আমাদের আবহমান কালের ধ্যান-ধারণা যেন তিনি এক পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিলেন, বললেন, দুটি ক্ষেত্রেই আলোর গতি অপরিবর্তিত থাকবে—সেই গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার।

মূল সূত্রদ্বয় থেকে লব্ধ সিদ্ধান্ত : এবার আমরা খতিয়ে দেখব, ঐ দুই মূল সূত্রের নিরিখে বস্তুর গুণ—বিশেষ করে যে গুণগুলিকে দার্শনিক লক বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রাথমিক গুণ বলেছিলেন—সেগুলি কী রূপ নিচ্ছে, বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ভর (mass) তার সময়ের ধ্যান-ধারণা। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। মনে করা যাক, একজোড়া ছবছ একই জাতের দুটি মহাকাশযান বা রকেট, A এবং B মহাকাশ পাড়ি দিচ্ছে। তাদের ওজন, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ভর সবই সমান এবং তারা একই মুহূর্তে রওনা হল—কিন্তু A-এর গতি কিছু বেশি, ধরা যাক তাদের আপেক্ষিক গতি হচ্ছে v । আর মনে করা যাক, ওরা যে মুহূর্তে রওনা হল ঠিক তখনই আকাশে একটা নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটল। যেহেতু আলোকরশ্মি ওদের কাছে এসে পৌঁছাতে

কিছুটা সময় লাগবে তাই ওরা তখনই তা দেখতে পেল না। ধরা যাক, যে সময়ের ব্যবধানে ওরা নক্ষত্রের বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করল সেটার মাপ t । সেই সময়ের মধ্যে A তার সহযাত্রী B-কে x পরিমাণ দৈর্ঘ্য ছাড়িয়ে এসেছে। চিত্র—১৭-তে ব্যাপারটা ঐকে দেখানো হয়েছে।

ফিট্জেরাল্ড ইতিপূর্বেই বলেছিলেন, এক্ষেত্রে রকেট দুটির দৈর্ঘ্য কমে যাবে—যেহেতু তারা স্থির নয়, ঈশ্বার সমুদ্রে এগিয়ে যাচ্ছে। লরেন্জ সেই সঙ্কোচনের পরিমাপটাও একটি প্রমাণহীন কল্পিত ফর্মুলার (hypothetical formula) কষে বলে দিতে পেরেছিলেন। আইনস্টাইন বললেন, ওঁদের হিসাবটা ঠিকই ছিল। তিনি তার প্রমাণও



চিত্র—১৭

দাখিল করলেন—প্রমাণ অর্থে তিনি এ বিশ্ব-প্রপঞ্চের জন্যে কতকগুলি ফর্মুলা নির্দেশ করলেন; বললেন—‘স্থান ও কাল’ পরস্পর সংপৃক্ত। প্রতিটি বস্তু—মহাকাশের দানব তারকা থেকে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সব কিছু সেই অপরিবর্তনীয় আইন মেনে চলে। কেন চলে? এটাই জগতের ধর্ম। এটাই বিশ্ব ব্যবস্থার মূল সূত্র। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের ‘কারণ’ নির্দেশ করতে পারেননি, তার ‘কার্য-কারণ সম্পর্ক’ বিধিবদ্ধ করেছিলেন; বলেছিলেন—এইটাই হচ্ছে জগতের ধর্ম। আইনস্টাইন আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলেন। জগৎ-ব্যবস্থার মূল ধর্মটির আরও কাছাকাছি গিয়ে কতকগুলি সূত্র দিলেন। ‘কেন’ তা তিনিও বলতে পারেননি; ‘কেমন করে’ ‘কী নিয়মে’ তা বলতে পেরেছিলেন।

এবারে আমরা দেখব তাঁর সূত্রে বস্তুর মূল গুণগুলি কীভাবে পরিবর্তিত হল:

(ক) দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচন : চিত্র—১৭-তে উল্লিখিত মহাকাশযানে অবস্থিত বৈমানিকদ্বয় যদি তাঁদের নিজ নিজ রকেটের দৈর্ঘ্য মেপে দেখেন তাহলে দেখবেন তা অপরিবর্তিতই আছে—সেই L পরিমাণ দীর্ঘ। কিন্তু ওদের আপেক্ষিক গতি যখন v তখন A যদি কোন যন্ত্রের সাহায্যে B-র দৈর্ঘ্য মাপতে পারত তবে দেখতো B-র দৈর্ঘ্য কিছুটা কমে গেছে। সেই সঙ্কোচনের পরিমাপটা পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত ফর্মুলা থেকে :

$$L' = L \times \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad \dots (i)$$

এখানে— L হচ্ছে ওদের প্রাথমিক দৈর্ঘ্য, v হচ্ছে আপেক্ষিক গতি, c আলোর গতি, (যা A অথবা B-র গতির উপর নির্ভরশীল নয়, সর্বদাই ৩,০০,০০০ কিমি/সে.) এবং L' হচ্ছে A-র হিসাবমতো B-এর দৈর্ঘ্য। একটা বাস্তব উদাহরণ নিলে কিছুটা ধারণা হবে। ধরা যাক, রকেটের প্রাথমিক দৈর্ঘ্য অর্থাৎ $L =$ বিশ মিটার এবং ওদের আপেক্ষিক গতি, $v = ১,৫০,০০০$ কিলোমিটার/সেকেন্ড (মানে আলোর গতির আধাআধি)। সেক্ষেত্রে অঙ্কটা কষলে আমরা দেখব $L' = ১৭$ মিটার; তার মানে A-র কাছে B-র দৈর্ঘ্য ৩ মিটার কমে গেছে। আপেক্ষিক গতিটা যত বাড়বে L' ততই কমবে। v যদি হয় আলোর গতির শতকরা নব্বই ভাগ, অর্থাৎ ২,৭০,০০০ কি মি./সেকেন্ড তাহলে হিসাবে দেখছি L' আরও কমে হচ্ছে দশ মিটার অর্থাৎ প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের আধাআধি। ধরুন v যদি শূন্য হয়, অর্থাৎ আপেক্ষিক গতি না থাকে? অঙ্কের হিসাবে তখন $L = L'$ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকবে। এবারে বলুন তো ঐ ‘ $v = ০$ ’ মানে কি? আপেক্ষিক গতি নেই? তা তো জানি, কিন্তু তারই বা অর্থ কি? কী বললেন? দুটোই স্থির আছে? আঙো না। ভুল হল। এ দুনিয়ায় কিছুই স্থির নেই, $v = ০$ অর্থে দুটোই একই দিকে একই গতিতে যাচ্ছে।

প্রশ্ন হতে পারে B যদি ঐ অবস্থায় A-র দৈর্ঘ্য মাপে, তবে কী দেখবে? একই জিনিস দেখবে; দেখবে A ঐভাবে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। অথচ A এবং B দুজনেই

নিজ নিজ আকাশযানের দৈর্ঘ্য মেপে সব সময়েই ঐ বিশ মিটার পাবে, কারণ তাদের মাপকাটিটাও যে ঐভাবে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে।

আরও প্রশ্ন হতে পারে—তাই যদি হবে তাহলে এতদিন বিজ্ঞান সেটা টের পায়নি কেন? জবাবে বলব—আপেক্ষিক গতি যতক্ষণ না আলোর গতির সঙ্গে তুলনীয় মান লাভ করেছে ততক্ষণ বাস্তবে এ সঙ্কোচন ঘবা পড়ে না। একটা বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি। ধরুন একটা এয়ারোপ্লেন ঘণ্টায় ১২০০ কিমি/ বেগে যাচ্ছে—এক্ষেত্রে ঐ ফর্মুলায় ফেলে দেখতে পারেন, সঙ্কোচনের পরিমাণ এক মিলিমিটারের লক্ষ ভাগের কাছাকাছি।

অনেকক্ষণ অঙ্ক কষেছি, এবার একটু কাব্য আলোচনা হোক। ফিট্জেরাল্ডের ঐ দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচন সম্বন্ধে সমসাময়িক এক ইংরাজ কবি যে লিমেরিকটি রচনা করেছিলেন এবার তা পাঠকদের উপহার দিই:

“There was a young fellow named Frisk
Whose fencing was exceedingly brisk :
So fast was his action,
The Fitzgerald contraction
Reduced his rapier to a disk.”

ভাবার্থ অনুবাদ করে সাদা বাংলায় বলতে পারি :

বাপ্পরে কি চটপটে পালোয়ান ভোম্বল,
বন্বন, সাঁই সাঁই ঘোরাতো সে ডাম্বল!
বিদ্যুৎগতি বেগে
ফিট্জেরাল্ড চাপ লেগে
ডাম্বল চেপটিয়ে হল শেষে কম্বল!!

(খ) ভর (mass)-এর বৃদ্ধি : নিউটনের মতে—যে মত মেনে নিয়ে কয়েক শতাব্দী ধরে বিজ্ঞান অগ্রসর হয়েছে—কোন বস্তুর ‘ওজন’ নানা কারণে হ্রাসবৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে পারে; কিন্তু তার ‘ভর’ চিরকাল অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ ‘ভর’ হচ্ছে বস্তুর নিজস্ব আদিগুণ—গরম করলে তার আয়তন বদলায়, চাঁদে নিয়ে গেলে তার ওজন বদলায়, কিন্তু বস্তুর ভর বা mass অপরিবর্তনীয়। আইনস্টাইন তাঁর নূতন সূত্রে বললেন, কথাটা ঠিক নয়। বস্তুর ভর তার আপেক্ষিক গতির উপর নির্ভরশীল। উপরের উদাহরণে যদি মনে করি দুটি আকাশযানের (যখন তাদের আপেক্ষিক গতি ছিল শূন্য) ভর (ওজনও) আদি অবস্থায় ছিল m , তাহলে এখন একে অপরের ভর (ওজনও) পাবে m' এই সূত্র :

$$m' = m \div \sqrt{1 - v^2/c^2} \quad \dots (II)$$

ধরা যাক আদি অবস্থায় (যখন $v = 0$) ওদের দুজনেরই ওজন ছিল ১০০০ কে.জি.। এখন যদি ওদের আপেক্ষিক গতি হয় আলোর গতির আধাআধি (১,৫০,০০০ কিমি/সে.) তাহলে m' হয়ে যাবে ১২০০ কেজি। তার মানে A কোন যন্ত্রের সাহায্যে B-র ওজন মাপতে পারলে দেখবে যে, B-এর ওজন ২০০ কেজি বেড়ে

গেছে। B-ও মাপতে পারলে দেখবে A-র ওজন ঐভাবে বেড়ে গেছে। ঐ ফর্মুলায় $v = 0$ হলে পাচ্ছি $m' = m$; অর্থাৎ আপেক্ষিক গতি না থাকলে কেউ কারও ওজনে কিছু হেরফের পাবে না।

তার মানে কী দাঁড়ালো? ওজন কমানোর জন্য যত ছোট্টাছুটি করব ততই ওজন বাড়বে? হিসাব তো তাই বলছে। ফর্মুলায় ফেলে দেখেছি একজন দেড়শ কেজি-র মেদের মৈনাক যদি ঘণ্টায় পঁচিশ কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারেন (কল্পনা করতে পারছেন?) তবে তাঁর ওজন এক গ্রামের লক্ষ ভাগের প্রায় এক ভাগ বেড়ে যাবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, এমন কৌতুককর বিষয়টি নিয়ে লেখা সেই ইংরাজ কবির কোন লিমেরিক খুঁজে পাইনি। আমি কিন্তু লোভ সামলাতে পারলুম না:

ভুঁড়ির খাঁজে চর্বি দেখে তব্বী মোদের স্বাতীদি
হুলা-হুলা নাচ নাচিতে গেলেন চলে তাহিতি।
নাচের ‘গতি’ বাড়ল যত
‘ভর’-ভরাস্ত হলেন তত;
নৃত্যশেষে তব্বী স্বাতী হলেন নি-গুঁড় হাতীদি!

এখানে একটা কথা বলে রাখি—‘ভর’ বা mass বাড়ছে মানে আয়তন বাড়ছে না কিন্তু; আকারে যে কমছে তা তো আগেই বলেছি। পদার্থ বিদ্যা যাঁরা কিছুটা



চিত্র-১৮

পড়েছেন তাঁরা হয়তো বলবেন—তবে কি বুঝব ঘনত্ব (density) বাড়ছে? জবাবে বলব—আজ্ঞে হ্যাঁ।

(গ) আপেক্ষিক গতির বৃদ্ধি : ইতিপূর্বে চিত্র—১৬-তে একটা অসঙ্গতির কোন কিনারা হয়নি। আগুবােকের মতো তখন শুধু বলেছিলাম—কোন কিছুই ঐ আলোর গতি অর্থাৎ ৩,০০,০০০ কিলোমিটার/সেকেন্ড কিছুতেই অতিক্রম করবে না। কিন্তু কোন্ ফর্মুলায়? এবার সেই ফর্মুলাটা আমরা লিপিবদ্ধ করব। ধরা যাক, দুটি গাড়ি A এবং B পরস্পরের দিকে ঘন্টায় ১০০ কি.মি. বেগে ছুটে আসছে (চিত্র—১৮ ক) আর যদুবাবু মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন (অশাস্ত্রীয় কিছু বলিনি, যদুবাবু দুই গাড়ি সমেত পৃথিবীর বাসিন্দা, যে পৃথিবী সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার বেগে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে; সে কথা এ হিসাবে আনছি না)। এক্ষেত্রে যদুবাবুর কাছে দুটি গাড়িরই আপেক্ষিক গতিবেগ ১০০ কিমি ঘন্টা। কিন্তু যে কোন গাড়ির ড্রাইভারের কাছে অপর গাড়ির আপেক্ষিক গতি $১০০+১০০=২০০$ কিমি/ঘ.। অঙ্কের সূত্রে এটাকে বলব:

$V_{AB} = V_A + V_B = ১০০ + ১০০ = ২০০$ /ঘ. ঐ অঙ্কে V_{AB} হচ্ছে A অথবা B-র আপেক্ষিক গতি অপর গাড়ির তুলনায়। V_A হচ্ছে স্থির বিন্দু যদুবাবুর তুলনায় A-র আপেক্ষিক গতি, V_B হচ্ছে যদুবাবুর তুলনায় B-র আপেক্ষিক গতি।

এইবার ধরা যাক যদুবাবুকে একটা চন্দ্রযানে তুলে মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। যদুবাবু স্থিরই থাকুন আর গতিশীলই হোন তাঁর আপেক্ষিকে ধরা যাক A এবং B-র গতি যথাক্রমে V_A এবং V_B (চিত্রে $V_A = V_B = ২,৫০,০০০$ কিমি/সে.। এই অবস্থায় যদি A তার নিজের আপেক্ষিকে B-র গতি মেপে দেখে অথবা যা একই কথা, B তার নিজের আপেক্ষিকে A-র গতি মেপে দেখে, তখন আর উপরোক্ত সরল ফর্মুলা $V_{AB} = V_A + V_B$ নির্ভুল হবে না। আগেরটা মোটামুটি নির্ভুল ছিল যেহেতু চিত্র—১৮/ক-তে মোটর গাড়ির গতিবেগ আলোর গতির তুলনায় ছিল অতি নগণ্য। এখন ফর্মুলাটা হবে :

$$V_{AB} = (V_A + V_B) \div \left(1 + \frac{V_A + V_B}{c^2} \right)$$

[c = আলোর গতি]... (iii)

আমাদের চিত্র—১৮/খ-তে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হয়েছে ($V_A = V_B = ২,৫০,০০০$ কিমি/সে. এবং $c = ৩,০০,০০০$ কিমি/সে) তা ঐ ফর্মুলায় বসালে আমরা পাব $V_{AB} = ১,৮৮,৭৯৭$ কিমি/সে.।

(ঘ) গতির সর্বোচ্চ সীমা: আপেক্ষিকতাবাদের সবচেয়ে বিস্ময়কর কথাটা বোধ হয় এই—কোন জাগতিক বস্তু গতিবৃদ্ধি করতে করতে আলোর গতির সমান হতে পারবে না, বা তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। সেই সর্বোচ্চ গতিসীমা হচ্ছে আলোকতরঙ্গের গতি—আরও বিজ্ঞানসন্মত ভাষায় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যাবতীয় তরঙ্গের গতিবেগ। কারণটা বোঝা যাবে আমরা যদি আমাদের ইতিপূর্বে লব্ধ সমীকরণে আপেক্ষিক গতি v -কে c -এর সমান অথবা বড় ধরে নিয়ে ফলাফলটা লক্ষ্য করি। প্রথম সমীকরণে আমরা দেখেছি—আপেক্ষিক গতি যত বাড়বে দৈর্ঘ্য

তত কমবে। সেখানে যদি $v=c$ বসাই তাহলে অঙ্কশাস্ত্র মতে L হয়ে যায় শূন্য। তার মানে বস্তুটা উবে যাবে! v যদি c -এর চেয়ে বড় হয় তাহলেও অবাস্তব অবস্থায় উপনীত হচ্ছি আমরা।

একই ভাবে দ্বিতীয় সমীকরণে $v = c$ বসালে আমরা পাচ্ছি $m =$ অনন্ত!

তাই আইনস্টাইনের থিয়োরি বলছে—কোন বস্তুর গতিই আলোকতরঙ্গের গতিসীমার সমান হতে পারবে না, বা তাকে অতিক্রম করতে পারবে না।

তত্ত্বটার অর্থ ঠিকমতো বুঝে নিতে এখানে আমরা একটা কাল্পনিক বিচারসভার আয়োজন করেছি। একপক্ষে আছেন একজন রক্ষণশীল ডক্টর নিউটনিয়ান, অপরপক্ষে প্রফেসর আপেক্ষিকতাবাদী।

নিউটনিয়ান বললেন, প্রফেসর, আপনার ঐ শেষ যুক্তিটায় কেমন যেন গা-জুরি ভাব আছে না? ৩,০০,০০০ কিমি/সে. একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা—আগুবােকের মতো যদি আপনি বলেন ওটাকে ডিঙিয়ে গেলে জাত যাবে তা কেমন করে মানি?

আপেক্ষিকতাবাদী বললেন, ডক্টর, এ বৈজ্ঞানিক আলোচনা সভায় আসুন আমরা ব্যঙ্গ এবং বিদ্রপকে পরিহার করে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনা করি। জাত যাবার কথা আমি বলিনি। বলেছি,—ধরে নিন, ওটা আমার থিয়োরির একটা ‘অ্যাক্সাম’, স্বতঃসিদ্ধান্ত। ওটা মেনে নিলে জগৎ-প্রপঞ্চের আর সব কিছু আমি ব্যাখ্যা করে দেব।

ডক্টর নিউটনিয়ান বললেন, স্বতঃসিদ্ধান্ত আমরা প্রমাণ করতে পারি না, কিন্তু সেটা স্ব-বিরোধী হয় না। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে যে কয়টি স্বতঃসিদ্ধান্ত আছে, তার প্রমাণ নেই কিন্তু তা বিশ্বাস করতে বাধে না। তা স্ব-বিরোধী নয়।

—আমার সূত্রটা কি জন্য স্ব-বিরোধী?

—ধরুন আমি পৃথিবী থেকে একটা রকেট ছাড়লাম যার নাকের ডগায় আরও একটি ছোট রকেট আছে এবং ঐ যৌথ রকেটের সঙ্গে পৃথিবীর আপেক্ষিক গতি $০.৯c$ —এটা আমি পারি কিনা?

—বাস্তবে পারেন কিনা জানি না, অঙ্কের হিসাবে মেনে নিলাম—পারেন।

—এবার, অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ ত্যাগ করার পর ঐ ছোট রকেটটিকে মূল রকেট থেকে ছেড়ে দিলাম যাতে মূল রকেটের সঙ্গে তার আপেক্ষিক গতিবেগ হয় $০.৯c$ । পারি?

—ধরা যাক, পারেন।

—তখন ভূ-পৃষ্ঠের সঙ্গে ঐ ছোট রকেটটার আপেক্ষিক গতিবেগ $০.৯c + ০.৯c = ১.৮c$ হবে না?

—আজ্ঞে না। আমার ফর্মুলা অনুযায়ী ওটা কষলে দেখবেন, অঙ্কের উত্তর হবে $০.৯c$ । ঐ ছোট রকেটের উপর থেকে যদি আরও ছোট একটি অনুরূপ রকেট ছাড়েন তবে ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে তার আপেক্ষিক গতিবেগ হবে $০.৯৯৯c$ । কোনদিনই আপনি ঐ ‘C’ সংখ্যাটির নাগাল পাবেন না।

ডক্টর এবার একটি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুললেন, প্রফেসর, আপনি কি জন্মমুহূর্তে

‘গুংগা’ বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন?

অধ্যাপক আপেক্ষিকতাবাদীর বিহুল দৃষ্টি দেখে বোঝা যায়, এ অদ্ভুত প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা তিনি ধরতে পারেননি। ডক্টর নিউটনিয়ান বলেন, চণ্ডীদাসের খুড়োমশাই শুনেছি অমন একটা ‘আজব কল’ তৈরি করেছিলেন—যত জোরেই ছোটো লক্ষ্যবস্তুর নাগাল পাবে না।

অধ্যাপক আপেক্ষিকতাবাদী বললেন, যেহেতু ইতিপূর্বেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পরিহার করব বলে আমরা দুজনেই প্রতিশ্রুত, তাই ধরে নিচ্ছি আপনি সিরিয়াস। সেজন্য জবাবে বলছি—না, চণ্ডীদাসের খুড়োমশাই-এর সেই আজব কলে মুখ ও মণ্ডামিঠাই-এর দূরত্বটা খুড়োমশায়ের গতি-নিরপেক্ষ ছিল; আমার এ হিসাব ‘আবোল তাবোল’ নয় এক্ষেত্রে গতি যত বাড়বে আপেক্ষিক গতিও তত বাড়বে; কিন্তু ঐ ৩,০০,০০০ কিমি/সে. গতিসীমা কিছুতেই ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

ডক্টর স্পষ্টতই লজ্জিত হয়ে পড়েন। বলেন, আ’য়াম্ সরি প্রফেসর; কিন্তু আপনি যে অঙ্কশাস্ত্রটাকে ‘নয়-ছয়’ করে দিচ্ছেন!

—দিচ্ছি না। একটা উদাহরণ দিই : $৯ \times ০ = ০$ এবং $৬ \times ০ = ০$; মানেন তো?

—কেন মানব না? নিশ্চয়ই মানব।

—এবার দুটি সমীকরণকেই যদি দু-দিকেই শূন্য দিয়ে ভাগ দিই তাহলে পাব $৯ = ০ = ৬$ । অঙ্কশাস্ত্রটা নয়-ছয় হল কিনা?

—কী আশ্চর্য! তা কি করে হবে? শূন্য দিয়ে যে ভাগ দেওয়া যায় না!

—কেন যায় না? কার আপ্তবাক্য অনুসারে?

—কী মুশকিল! এটা তো অঙ্কশাস্ত্রের মৌলিক নিয়ম, না হলে অঙ্ক মেলে না।

—আলোর গতিকে অতিক্রম করা যায় না, এটাও আমার মতে একটা মৌলিক নিয়ম, না হলে অঙ্ক মেলে না!

—আপনি কি কোন মতেই ঐ উদ্ভূটে সূত্রটা প্রত্যাহার করবেন না?

—করতে পারি এক শর্তে। আপনি একটা বিকল্প সূত্র দিন, যাতে সব সমস্যার সমাধান কষে বের করা যাবে—ঐ মাইকেলসন-মর্লের পরীক্ষা কেন ব্যর্থ হল সেটা সমেত।

এখানেই আমাদের নাটকের যবনিকা : কারণ ডক্টর নিউটনিয়ান এ কথায় মনে করলেন তাঁকে অপমান করা হয়েছে। তিনি সঙ্কোভে বিচারসভা ত্যাগ করলেন।

আলোর গতিসীমা অতিক্রম করতে পারলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে তা কিন্তু ইংরাজ কবিটি বুঝিয়ে দিয়েছেন আর একটি অপূর্ব লিমেरिकে—

“There once was a lady called Bright,
Who could travel faster than light;
She went out one day,
In an Einsteinian way
And came back the previous night.”

এ পর্যন্ত পড়ে পাঠকের কী অবস্থা হয়েছে জানি না, লেখকের তো রীতিমতো মাথা বিম্বিম্ব করছে। বোধ করি সেই জন্যই বহু চেষ্টা করেও এই লিমেरिकটির অনুবাদ করতে পারলাম না। একটা ভাব মাথায় আসছে—বড়বাজারে সারি সারি দোকানে বায়না নেওয়া আছে! হালখাতার পূজা সারতে হবে। পয়লা বৈশাখ

ব্রাহ্মমুহুর্তে উঠেই অর্কফলায় করবী ফুল বেঁধে ঠাকুরমশাই হালখাতা সারতে বার হলেন। সমস্ত চত্বরটা ‘বিদ্যুদ্ভাষিত-বেগে’ পরিক্রমা করে সন্ধ্যাবেলায় যখন ঘর্মান্ত কলেবরে বাসায় ফিরে এলেন তখন হিসাব করে দেখলেন সেটা চৈত্র-সংক্রান্তির সন্ধ্যা!

(ঙ) ‘ভর’ এবং ‘শক্তি’ সংপৃক্ত : বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আপেক্ষিকতাবাদের জনক যে ছোট সূত্রটি উপহার দিয়েছিলেন $E=mc^2$, এবার তার কথা বলব। ঐ সূত্রের সরণী বেয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কীভাবে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কৃত হল সে-কথা আমার ‘বিশ্বাসঘাতক’ গ্রন্থে সবিস্তারে বলেছি। ঐ ফর্মুলাটা কী ভাবে উনি পেলেন এখন শুধু তাই বলি : আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর ‘ভর’ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলে তার শক্তিরও বৃদ্ধি হয়; কারণ, একই গতিসম্পন্ন দুটি বস্তুর মধ্যে যদি একটার ওজন (ভর বেশি হয় তবে সেটি বেশি শক্তিশালীও হয়। আইনস্টাইন অঙ্ক কষে দেখালেন—ভর বৃদ্ধির জন্য যে অতিরিক্ত শক্তি পাওয়া যাচ্ছে সেটার পরিমাণ ভর-বৃদ্ধির সঙ্গে আলোর গতির বর্গের গুণফল। এটা যখন অঙ্ক কষে মিলে যাচ্ছে তখন শুধু ভর-বৃদ্ধিটুকু নয়—কোনও বস্তুর সম্পূর্ণ ভরকে অনুরূপ সূত্রের সাহায্যে শুধুমাত্র শক্তিরূপে কেন কল্পনা করা যাবে না? এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলেন আইনস্টাইন—তাঁর ঐ ক্ষুদ্রতম সমীকরণ সূত্রে $E=mc^2$; যেখানে E হচ্ছে শক্তির পরিমাণ, m হচ্ছে ভর এবং c যথার্থীতি আলোর গতি।

পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বেই তিনি বললেন, কণামাত্র বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে ধারণাতীত শক্তির জন্ম দেওয়া যাবে। বস্তুত একশ গ্রাম ওজনের একটা কয়লার টুকরোকে যদি সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তবে উৎপন্ন শক্তির দ্বারা সারা ভারতবর্ষের সব কটা বয়লার, সব কটা রেলের চাকা সারা বছর ধরে চালানো যাবে।

আপনি বলতে পারেন, তা হচ্ছে কই মশাই? একশ গ্রাম কয়লা পুড়লে তো এক কেটলি চায়ের জলও গরম হয় না। তা হয়তো হয় না; কিন্তু সেক্ষেত্রে তো আপনি কয়লাটা ‘সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট’ করলেন না—উনুনের ল্যাবরেটরিতে কতকগুলো রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটালেন মাত্র। ছিল কয়লা, হল ছাই—কিছুটা গ্যাস, কিছুটা অঙ্গারপিণ্ড—দিয়ে গেল কিছুটা উত্তাপ, যাতে চায়ের কেটলিটাও ফুটল না। ‘সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট’ হলেও অবশ্য আপনার চা-পান-এর সৌভাগ্য হত না—প্রচণ্ড শক্তির বিস্ফোরণে আপনাদের গোটা শহরটাই হিরোসিমায় পরিণত হত!

(চ) আপেক্ষিকতাবাদে ‘সময়’-এর অভিধা : চিত্র—১৭-তে দুই সহযাত্রীর দৈর্ঘ্য এবং ভর কিভাবে বদলেছে তা আমরা আলোচনা করেছি; কিন্তু তখন ওদের কালগণনাতে কোন তারতম্য হচ্ছে কিনা সে প্রশ্ন তুলিনি। বরং আমরা বলেছিলাম, নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ওরা দেখবে ‘t’ সময়ের ব্যবধানে। বলিনি, সেটা কার ঘড়ি অনুসারে—A না B! আমরা যেন ধরে নিয়েছিলাম ওদের ফুটরুল, স্প্রিং-ব্যালেন্স পাগলামি শুরু করলেও ঘড়ি দুটো ঠিক সময় দিচ্ছিল। তখন সে প্রশ্ন তুলিনি,

তার কারণ কালের পরিবর্তনটা আরও বিস্ময়কর, আরও যেন অবিশ্বাস্য। আমাদের ধ্যান-ধারণায় সেটা আরও বড় জাতের অবাক-করা খবর। এতক্ষণ হেলে ধরে হাত পাকিয়েছি, এবার আসুন—দেখা যাক কেউটে ধরা যায় কিনা।

প্রথমেই বলে রাখি, আপেক্ষিকতাবাদ বলছে—আপেক্ষিক গতির বৃদ্ধির সঙ্গে সময়ের ক্রমশঃ হ্রাস হবে। কতটা? নীচের ফর্মুলা সেটার হৃদিস দেবে :

$$t' = t \times \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad \dots(iv)$$

এখানে 't' হচ্ছে সময়ের ব্যবধান যা A দেখবে B ঘড়িতে, অথবা B দেখবে A-ঘড়িতে। নিজের নিজের ঘড়িতে তারা সময়ের ব্যবধানটা 't' পরিমাণই দেখবে।

বীজগণিত ছেড়ে একটা বাস্তব উদাহরণ নিই। ধরা যাক, ঠিক বেলা বারোটায় দুটি ঘড়ি একই সময় দিচ্ছিল এবং রকেট দুটির আপেক্ষিক গতি ছিল শূন্য। তার পরমুহূর্ত থেকেই দুজনের আপেক্ষিক গতির ফারাক হল ১,০০,০০০ কি.মি/সে.

$\left(v = \frac{c}{2}\right)$ এক্ষেত্রে নিজ ঘড়িতে বেলা একটার সময় A দেখবে B-র ঘড়িতে একটা বাজতে ছয়। B দেখবে তার ঘড়ি ঠিকই আছে, অর্থাৎ তার নিজের ঘড়িতে যখন বেলা একটা বাজে এবং A-র ঘড়ি ছয় মিনিট স্লো। আপেক্ষিক গতিটা যদি বেড়ে হয় ২,৭০,০০০ কিমি/সে. তাহলে যে কোন একজন যখন নিজের ঘড়িতে দেখবে বেলা একটা তখন অপরের ঘড়িতে দেখবে সাড়ে বারোট। এই যে ঘড়ি স্লো হয়ে যাচ্ছে, সেটা দুটি ক্ষেত্রে একই রকম হবে—যখন A এগিয়ে আসছে B-এর দিকে; কিম্বা পিছিয়ে যাচ্ছে B-এর কাছ থেকে। আপেক্ষিক গতির জন্য একের যে মনে হচ্ছে অপরের ঘড়িটা স্লো হয়ে গেছে, তার সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনাটা আমাদের স্থিরমস্তিষ্কে বুঝে নিতে হবে। গতির সঙ্গে সঙ্গে সময়ের গতিটা কমে যাচ্ছে, তার মানে কি? ঘড়ির দোষে নয়—‘কালের অতিবাহন ছন্দটাই স্লথ হয়ে যাচ্ছে। তার অর্থ, ওখানে বালুকাঘড়ি থাকলেও সেটা স্লথ-গতি হত, মানুষের হৃদস্পন্দন, নাড়ির গতি, সব কিছুই একই মাপে স্লথ হয়ে যাবে, যে সময়ের ব্যবধানে কোন পরমাণুর ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে পাক খাচ্ছে সেই সময়টাও সমানভাবে প্রভাবিত হবে। এতে ‘কাল’ বা ‘সময়’ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণাটা ছিল সেটাকেই বদলে ফেলার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ‘সময়’ বলতে আমরা কী বুঝি, সংজ্ঞা দিয়ে বোঝানো মুশকিল; কিন্তু এটুকু জানি, এক ঘণ্টা বলতে আমি যা বুঝি, তুমিও তাই বোঝ। সেটা হচ্ছে ‘পৃথিবীর সূর্য্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্য্যোদয় এই সময়কালের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ’। চন্দ্রলোকে—যেখানে আঙ্গিক গতি $29\frac{1}{2}$ পার্থিব দিন, সেখানে এক ঘণ্টা সে অর্থে গ্রাহ্য নয়। সেখানে ঘণ্টা মানে ‘সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যোদয়’ এই সময়কালের চব্বিশ ঘণ্টার এক ভাগ না হলেও—পার্থিব এক ঘণ্টার পরিমিতি আমাদের বোধের নিরিখে চন্দ্রলোকেও অভিন্ন। কবিরা শুধু নয়, দার্শনিকরাও কল্পনা করেছেন—‘কাল’ যেন একটি প্রবহমান

নদী—যার গতি অপরিবর্তনশীল, গতিবেগে এবং দিকমুখে; যে মুহূর্তটি অতিক্রান্ত তাকে আর কিছুতে ফিরিয়েই আনা যাবে না। আইনস্টাইন এই ধারণাটার মূলেই কুঠারাঘাত করলেন। আদ্রা নক্ষত্র পৃথিবী থেকে প্রায় ৩০০ আলোকবর্ষ দূরে। সেখানে বসে যদি কোন দর্শক আজ, এই মুহূর্তে দিল্লী শহরকে দেখতে পায় তবে দেখতে পাবে সম্রাট আওরঙ্গজেবকে! কারণ আলমগীরের সময়ে পৃথিবী থেকে যে আলোক-রশ্মি রওনা হয়েছিল আজই তো তা আদ্রা-নক্ষত্রে পৌঁছালো। আদ্রা নক্ষত্রের বদলে দর্শকটি যদি থাকে অ্যান্ডোমেডা-গ্যালাক্সিতে তাহলে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সে কোন ‘মানুষ’কে দেখতে পাবে না—মানুষ তখনও আসেনি পৃথিবীতে—দেখতে পাবে ম্যামথ আর স্যেবর্-টুথড্-টাইগারদের! তাহলে কেমন করে বলি অতীতের মুহূর্তটিকে কোনক্রমেই ফিরিয়ে আনা যাবে না?

সময় স্লথগতি হওয়ার বিষয়ে আর একটা উদাহরণ নিয়ে আর একটু বিস্তার করা যাক! ধরুন, একটি রকেট আজ জনা-পাঁচেক যাত্রী নিয়ে স্বাতী নক্ষত্রের দিকে রওনা হল। স্বাতী নক্ষত্র ‘বুটস্’ মণ্ডলে এবং তার দূরত্ব তেত্রিশ আলোকবর্ষ! ধরা যাক, রকেটের গতিবেগ আলোর গতির খুব কাছাকাছি। তাহলে ঐ গতিবেগে ছুটলে আমাদের কল্পিত রকেটটি তেত্রিশ বছরের কিছু বেশি সময়ে ঐ স্বাতী-নক্ষত্রে পৌঁছবে। তৎক্ষণাৎ সে একই গতিবেগে পৃথিবীর দিকে রওনা হলে ছেষটি বছরের কিছু পরে পৃথিবীতে ফিরে আসবে।

যেহেতু রকেটের গতিবেগ ছিল আলোর গতির কাছাকাছি, তাই আকাশচারীদের ঘড়ি পৃথিবীর ঘড়ির তুলনায় অনেক ধীর গতিতে চলেছে। ওদের কাছে ঐ ছেষটি বছর সময়কাল হয়তো সপ্তাহ খানেক বলে মনে হবে। কিন্তু এদিকে পৃথিবীতে যে ছেষটি বছর কেটে গেছে! ফলে তরুণ আকাশচারীরা ফিরে এসে দেখবে—তাদের তরুণী ভার্যার দল পলিতকেশা বৃদ্ধা। ওদের দেড় দু’ বছরের রেখে যাওয়া ছেলেমেয়েরা ওদের চেয়ে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছরের বড়!

কিন্তু তাই বা কেন? আমরা তো দেখেছি—A-র তুলনায় B-র সময় যেমন স্লথ হবে তেমনি B-র তুলনায় A-র সময়ও তো তেমনি স্লথ হয়ে যাবে। গতিটা যখন আপেক্ষিক, তখন অনায়াসে মনে করা যায় রকেটটাই স্থির আছে—পৃথিবীই বরং তেত্রিশ দুকুনে ছেষটি আলোকবর্ষ দূরত্ব পাড়ি দিয়ে এল। সেক্ষেত্রে তো পৃথিবীর লোকের মনে হওয়ার কথা তাদের জীবনে মাত্র এক সপ্তাহ কাটলো আর রকেটবাসীরা ছেষটি বছরের বৃদ্ধ হয়ে গেছে!

যুক্তিতে ফাঁক নেই। তাহলে কোন্টা সত্য? কারা বুড়ো হবে? অঙ্কশাস্ত্রমতে দুটোই সত্য; কিন্তু বাস্তবে তো দুটোই সত্য হতে পারে না?

এখানে অসঙ্গতি কোথায় হচ্ছে জানেন? ঐ সময়ে সঙ্কুচিত হয়ে যাবার সূত্রটা শুধুমাত্র ‘অপরিবর্তিত আপেক্ষিক গতি’র ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রথমেই বলেছি, স্পেশাল থিওরি সেখানেই শুধু সত্য যেখানে ‘ত্বরণ’ নেই, acceleration নেই—অর্থাৎ আপেক্ষিক গতিটা সব সময়ে অপরিবর্তিত। রকেটটা যাবার সময় এবং পৃথিবীতে ফেরার সময় এ নিয়ম মানেনি, মানতে পারে না; তাই ঐ

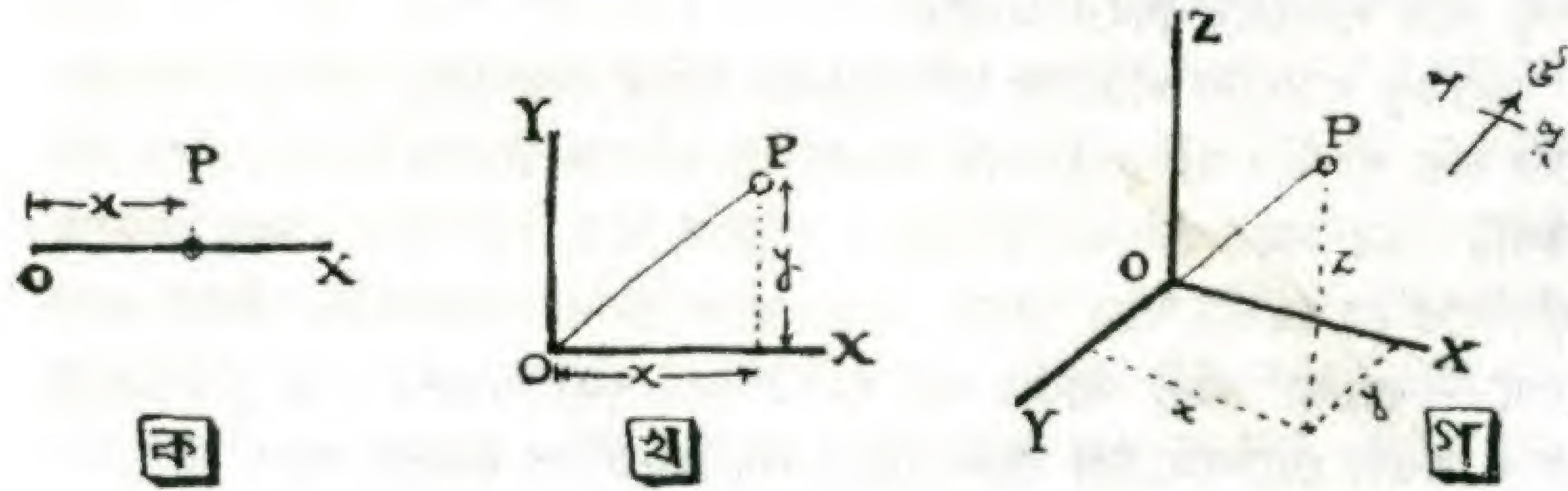
ফর্মুলাটাও এখানে খাটবে না।

মোট কথা দেখলাম, এতাবৎকাল ‘সময়’ সম্বন্ধে আমরা যে ধারণাটা পোষণ করে এসেছি সেটাই ভ্রান্ত। ‘কাল’ কোন একমুখী সমগতিতে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবহমান স্রোতের মতো নয়। ‘কাল’ হচ্ছে বিশ্বপ্রপঞ্চের একটি অঙ্গ, যার অপর অঙ্গ হচ্ছে ‘স্থান’। স্থান ও কাল অঙ্গাঙ্গিতাবে যুক্ত—একে অপরের উপর নির্ভরশীল, একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত। ‘বাক-অর্থ’ যেমন সংপৃক্ত—‘স্থান-কাল’ ও তেমনি সংপৃক্ত। এটা একটা নতুন জাতের ভাবনা—তাই এটাকে পরবর্তী পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করলে বোধ হয় ভালো হবে।

॥ তিন ॥

‘স্থান’ ও ‘কাল’-এর সংপৃক্তি

(ক) ত্রি-মাত্রিক স্থানের ধারণা : মাত্রা বা dimension কাকে বলি? সংজ্ঞা দিয়ে বোঝানোর চেয়ে উদাহরণ দিয়ে বোঝানো সহজ। চিত্র—১৯/ক-তে দেখুন OX



চিত্র—১৯

একটি সরলরেখা যেখানে P একটি বিন্দু, O থেকে X দূরত্বে অবস্থিত। এখানে P-বিন্দুটা একটি এক-মাত্রিক ভূমিতে সঞ্চারমাণ। শুধু মাত্র O থেকে তার দূরত্ব জানলেই P বিন্দু সম্বন্ধে সব কিছু জানা হয়ে গেল—তাকে সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে। চিত্র—১৯/খ একটি দ্বি-মাত্রিক ভূমি—এখানে OX এবং OY দুটি দিগদর্শক-রেখা বা অক্ষ। একটা রাস্তা যেন O বিন্দুর কাছে মোড় খেয়েছে। অর্থাৎ OX এবং OY সরলরেখা O বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে চারটি সমকোণ রচনা করেছে। এখানে P বিন্দুতে অবস্থান বোঝাতে দুটি মাত্রায় উল্লেখ করতে হচ্ছে, x এবং y। এই দুটি মাপ জানা থাকলে উৎপত্তি-স্থল O বিন্দু থেকে তার দূরত্বটা বার করা যাবে সহজেই। পিথাগোরাসের সেই বিখ্যাত উপপাদ্য, যা নাকি এককালে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বলে মুখস্থ করেছিলাম, সেই থিয়োরেমের সাহায্যে, অর্থাৎ $OP^2 = x^2 + y^2$

$$\text{ধরা যাক } x=৩\text{মি. } y=৪\text{মি. ; সেক্ষেত্রে } OP^2=৩^2+৪^2 \\ =৩\times৩+৪\times৪=৯+১৬=২৫=৫^2$$

অর্থাৎ $OP=৫$ মিটার।

এবার আসুন তিন-মাত্রার প্রসঙ্গে। চিত্র—১৯/গ-তে ধরুন O বিন্দু হচ্ছে দমদম এয়ারোড্রোম এবং P বিন্দু বিশেষ মুহূর্তে একটি উড্ডীয়মান বিমানের অবস্থান। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ঐ প্লেনের দূরত্ব জানতে হলে এবার আমাদের তিনটি মাত্রা জানতে হবে, x, y, z (চিত্র—১৯/গ)। যদি বলি, P বিন্দুর অবস্থান পূর্বদিক বরাবর ১২ কিলোমিটার, দক্ষিণ দিক বরাবর ৪ কিলোমিটার এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে সেটা আছে ৩ কিলোমিটার উঁচুতে, তাহলে ঐ একই সূত্রে আমরা জানতে পারব OP দূরত্বটা কত। অঙ্কটা কঠিন নয়, আসুন, কষেই ফেলা যাক :

$$OP^2 = x^2 + y^2 + z^2 = ১২^2 + ৪^2 + ৩^2 = ১২\times১২ + ৪\times৪ + ৩\times৩ \\ = ১৪৪ + ১৬ + ৯ = ১৬৯ = ১৩^2$$

অর্থাৎ $OP=১৩$ কিলোমিটার।

(খ) চতুর্থমাত্রা—‘কাল’ : আপেক্ষিকতাবাদ থিয়োরি বলছে, কোন দুটি দূরত্ব বোঝাতে ‘সময়’-এরও একটা ভূমিকা আছে। এবার ঐ ফর্মুলায় ‘কাল’কে ঢোকাতে হবে। বস্তুত আইনস্টাইন বললেন, দুটি বিন্দুর ‘স্থানিক দূরত্ব’ এই ধারাটাই অসম্পূর্ণ। দূরত্ব মাপা যাবে দুটি বিন্দুর নয়, দুটি ঘটনার—যে ঘটনা দুটি ঘটছে ত্রি-মাত্রিক স্থানিক দূরত্বে এবং এক-মাত্রিক সময়ের ব্যবধানে। উপরের উদাহরণে যদি ঐ x, y, z, মাত্রা তিনটি ঘোষণা করার পরে আরও বলতাম ১৬ই জুন, ১৯৭৫ সকাল ৯টা ৩৩ মিনিটে ঐ P বিন্দু থেকে পাইলট কন্ট্রোল টাওয়ারে বেতার-সঙ্কেত পাঠিয়ে সাড়া পেল না, যেহেতু ঐদিন ৯টা ৩১ মিনিটে দমদম কন্ট্রোল টাওয়ারের রেডিও-সিগনালার সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে হঠাৎ মারা গেছে, তাহলে সেই মর্মান্তিক দুটি ঘটনার দূরত্বটাই সত্য—বাদবাকি অর্ধসত্য।

অঙ্কশাস্ত্রের যে বিভাগ দ্বি-মাত্রিক সমস্যার সমাধান করে তা আমরা স্কুলে পড়ি—তার নাম জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি। তৃতীয় মাত্রা যোগ করে যে কঠিনতর সমস্যার সম্মুখীন হই তার সমাধান করে গোল ত্রিকোণমিতি (Spherical trigonometry) এবং ঘন-জ্যামিতি (Solid geometry)। চতুর্মাত্রিক সমস্যা—অর্থাৎ তিন-মাত্রার সঙ্গে ‘কাল’কে যুক্ত করে যে কঠিনতম অঙ্ক দেখা দেয় তার সমাধান করতে এক নতুন অঙ্কশাস্ত্রকে জন্ম দিতে হয়েছে। বাঙলায় তার নামকরণ বোধ করি এখনও হয়নি; বাঙলা হরফে সে শাস্ত্রের নাম টেনসর ক্যালকুলাস (Tensor Calculus)।

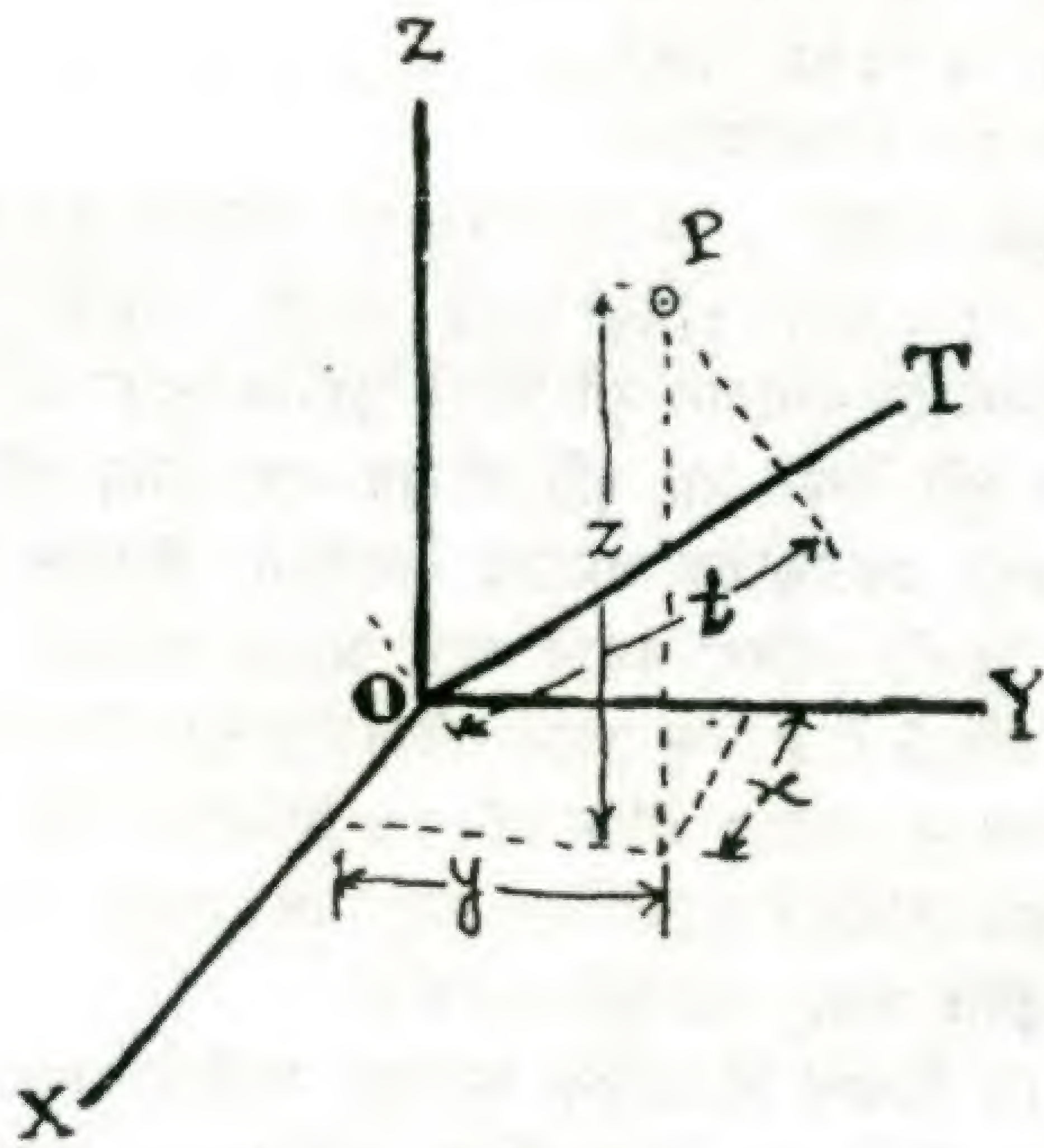
সে কঠিনতম শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়াই মঙ্গল। কিছুটা পড়ে বুঝবার চেষ্টা করেছিলাম—ফলাফল জানতে চাইবেন না, লজ্জা পাব। তার চেয়ে সে প্রশ্ন এড়িয়ে বরং আত্মাভিমান বজায় রেখে গভীর ভাবে বলি : ও আপনারা বুঝবেন না!

* ব্র্যাকেট-বন্ধনীর অন্তর্গত অংশটুকু বিজ্ঞান-শিক্ষিত বিশেষ পাঠকের জন্য। দুর্বোধ্য মনে হলে ঐ অংশটুকু বাদ দিয়ে পড়ে যান।

*{তবে হ্যাঁ, কিছুটা আভাস দিতে পারি :

চিত্র—২০-তে একটি চতুর্মাত্রিক ভূমিকে কল্পনা করা হয়েছে, যার তিনটি মাত্রা ‘স্থান-সূচক’, চতুর্থটি ‘কাল-সূচক’। বাস্তব ধারণা এখন করা যাচ্ছে না, নাই যাক—ওটাকে আপাতত প্রতীক-চিত্র বলে ধরে নিই—পরে আমরা দেখছি, চতুর্মাত্রিক ক্ষেত্র আমরা আদৌ ধারণা করতে পারব কিনা। এ ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা হবে

$OP = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - (ct)^2}$; ফর্মুলায় x, y, z যদি মিটারে প্রকাশিত হয় তবে ct -কে প্রকাশ করতে হবে লাইট-মিটারে। x, y, z যদি ফুটে প্রকাশিত হয় তবে ct -কে প্রকাশ করতে হবে ‘লাইট ফুট’-এ। ‘লাইট-ফুট’ কী? বলছি : ‘লাইট-ইয়ার’ বা আলোকবর্ষ হচ্ছে এক বছরে আলোকতরঙ্গ যতটা যায়। সেটার



চিত্র—২০

পরিমাণ হচ্ছে ৫.৮৮×10^{12} মাইল। সুতরাং আলোকবর্ষ হচ্ছে দূরত্বের মাপকাঠি—মাইলে বা কিলোমিটারে প্রকাশযোগ্য। ঐভাবে আলোর গতি থেকে একটা সময়ের মাপকাঠিও পাওয়া যেতে পারে—সেটাকে বলতে পারা যায় ‘আলোক-ফুট’। অর্থাৎ এক ফুট দূরত্ব যেতে আলোকতরঙ্গ যে সময়টুকু নেয়। অঙ্ক কষে দেখানো যায়—মেনেই নিই বরং যে, ১ আলোক-ফুট .০০০০০০০০১১ সেকেন্ড; যাকে অঙ্কশাস্ত্রমতে বলা যায় 1.1×10^{-8} সেকেন্ড।

আমরা যে বৈমানিকের কথা আলোচনা করছিলাম—যে বেচারী বেতারবার্তা পাঠিয়ে দমদম কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে সাড়া পেল না, তার উদাহরণটা বরং থাক, কারণ সেক্ষেত্রে অঙ্কটা কষলেও আমরা এত ছোট উত্তর পাব যার অর্থ বোধগম্য হবে না। বরং আর দুটি বড়জাতের মহাজাগতিক ঘটনার কথা ধরা যাক। ঘটনা দুটি এই রকম:

১) বিকিনি অ্যাটলে ১লা জুলাই ১৯৪৬ তারিখে সকাল ৯টায় একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটল।

২) মঙ্গলগ্রহে ঐদিন ৯টা ১০ মিনিটে একটা প্রকাণ্ড উল্কাপাত ঘটল।

ধরা যাক আরও বলা আছে যে, বিকিনি অ্যাটল থেকে সেই মুহূর্তে মঙ্গল গ্রহের ঐ উল্কাপাতের ‘স্থানিক দূরত্ব’ হচ্ছে ৬.৫×10^{11} ফুট। অর্থাৎ আমাদের ফর্মুলায় $X^2 + Y^2 + Z^2 = \{৬.৫ \times 10^{11}\}^2$ ।

কালের দূরত্ব অর্থাৎ সময়ের দূরত্ব কত? সময়ের ব্যবধান তো দেখছি ১০ মিনিট। আমরা জানি 1.1×10^{-8} সেকেন্ড = ১ আলো-ফুট।

১০ মিনিট = 10×60 সেকেন্ড = $(10 \times 60) \div (1.1 \times 10^{-8})$ আলো ফুট।

= ৫.৪×10^{11} আলো-ফুট।

$$\therefore \text{সুতরাং ফর্মুলায় ফেললে } OP^2 = x^2 + y^2 + z^2 - (ct)^2 \\ = \{৬.৫ \times 10^{11}\}^2 - [৫.৪ \times 10^{11}]^2 \\ = [(৬.৫)^2 - (৫.৪)^2] \times 10^{22}$$

$$\text{অর্থাৎ } OP = \sqrt{৪২ - ২৯} \times 10^{11} \\ = \sqrt{1২} \times 10^{11} = ৩.৬ \times 10^{11} \text{ ফুট}$$

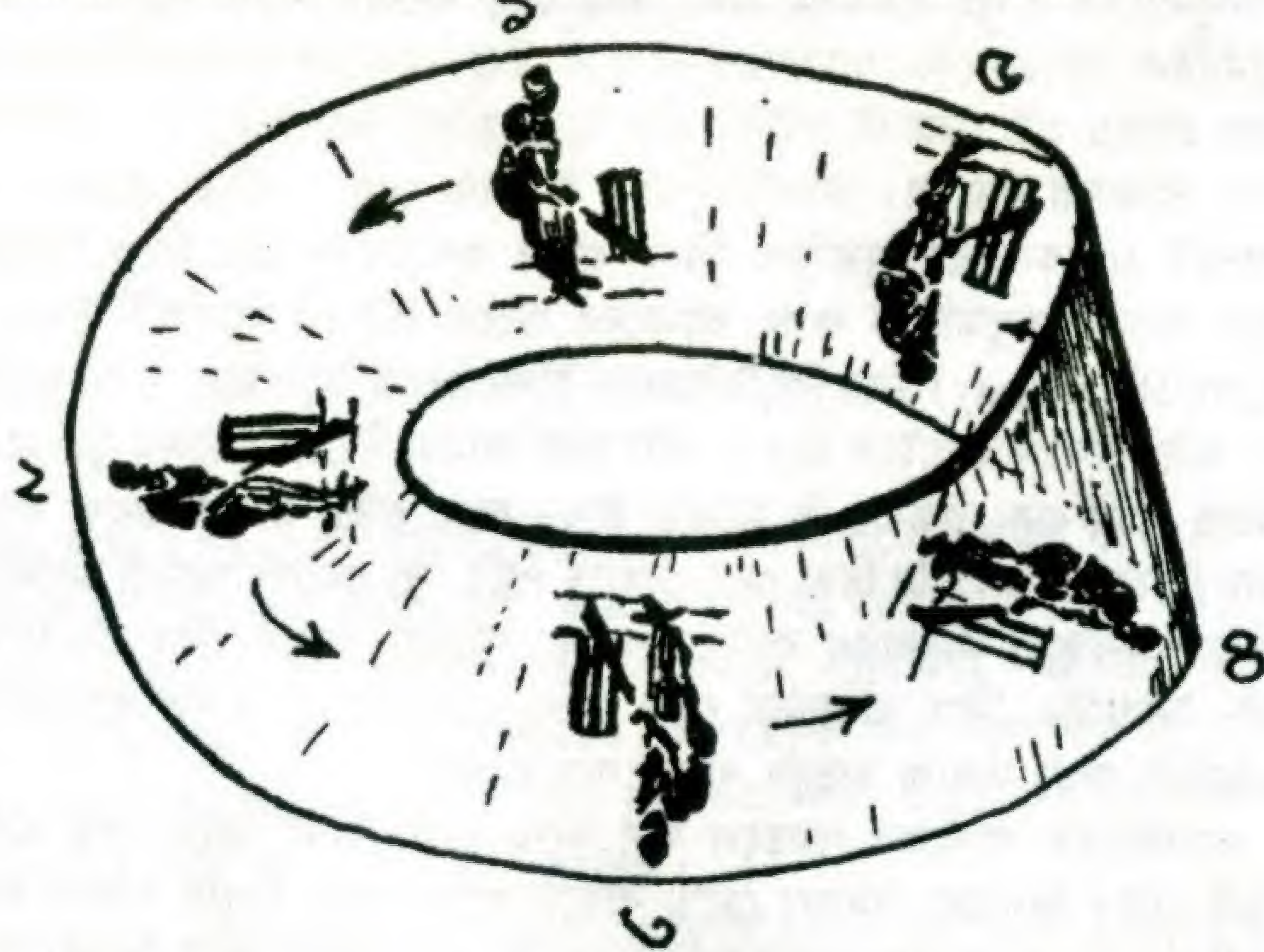
(গ) চতুর্মাত্রিক-ক্ষেত্রের ধারণা : এখানে যে অঙ্কটা কষলাম তা টেনসর ক্যালকুলাসের একটি সহজতম অঙ্ক। কিন্তু সেটা কষেছি নিছক ফর্মুলায় ফেলে, চতুর্মাত্রিক-ক্ষেত্রের কোন ধ্যানধারণা না করে। চিত্র—২০-তে যে চতুর্মাত্রিকক্ষেত্রটি আঁকা হয়েছে ওটা নেহাতই প্রতীক। চার-মাত্রাওয়ালা ক্ষেত্রের ধারণা ওভাবে ছবি এঁকে বোঝানো যায় না। কারণটা বুঝতে অসুবিধা নেই : আমরা আজন্ম—শুধু আজন্মই বা কেন, বংশানুক্রমিক ‘জিন’-বাহিত জন্মগত সংস্কার নিয়ে ত্রিমাত্রিক বিশ্বে অভ্যস্ত। চতুর্মাত্রিক জগৎ আমাদের চিন্তার বাইরে। কয়েকটি উপমা বা অনুরূপতা (analogy) নিয়ে কিছুটা আভাস-ইঙ্গিত দেওয়া চলে মাত্র। উপর-মহলের চার-মাত্রা নাগালের বাইরে হলেও মনে মনে আমরা নীচের মহলের দুই-মাত্রায় নামতে পারি এবং কল্পনায় দ্বি-মাত্রিক জীব—যারা তৃতীয়-মাত্রার ধারণা করতে অসমর্থ, তাদের অবস্থাটা চিন্তা করে দেখতে পারি। তা থেকেই আমরা নিজেদের অসহায় অবস্থাটা অনুধাবন করতে পারব। সুতরাং আসুন, কিছু দ্বি-মাত্রিক জীব—‘ছায়াজীব’ নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখি, তারা তাদের সীমিত ধ্যানধারণায় ত্রি-মাত্রিক জগৎ সম্বন্ধে কতদূর ধারণা করতে পারে।

ছায়াজীবেরা কাগজের সমতলে বাস করে, ওদের দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে, খাড়াই নেই। কাগজের সমতল ছেড়ে বাইরে আসার কথা চিন্তাই করতে পারে না। চিত্র—২১-এ আমরা যে ছায়াছবিটি দেখছি, মনে করুন, সেটি বিশ্বের সেরা ন্যাটা ব্যাটসম্যান গারফিল্ড সোবার্সের ছায়া। কাগজের সমতল তাঁর ক্রিকেট জগৎ। ঐ ছায়াটিকে কাগজের সমতলে নানান ভাবে ঘুরিয়েও আমরা সোবার্সের ছায়াকে রাইট-হ্যান্ড ব্যাটসম্যানে পরিণত করতে পারব না। সেটা করতে হলে ছায়াটিকে

কাগজের সমতল থেকে বাইরে এনে তৃতীয় মাত্রায় উলটিয়ে কাগজের উপর বসাতে হবে।

এবার একটি লম্বাটে কাগজের টুকরো নিয়ে তার দুটি প্রান্তকে আঠা দিয়ে আঁটুন; কিন্তু আঁটবার আগে চিত্র—২২-এর মতো একটা পাক দিয়ে নিন। এই কাগজের ভেঙ্কিটাকে বলে ‘মোবিয়াস-তল’। ভেঙ্কি কেন? বলছি। এবার ঐ ছায়ামূর্তিটাকে কাঁচি দিয়ে কাটুন এবং ঐ ‘মোবিয়াস-তল’ কাগজের গা-বরাবর টেনে নিয়ে চলুন। কল্পনা করুন, ঐ মোবিয়াস রাজ্যে ছায়া-সোবার্স একের পর এক পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ খেলে চলেছেন। কিছুদূর গেলেই দেখা যাবে পঞ্চম টেস্টের আগে নেট-প্র্যাক্টিসের সময় ছায়া-সোবার্স উল্টে পড়ে গেছেন। একেবারে শির-পা। (চিত্র—২২/৫)। তা তো হতেই পারে— খেলতে গেলে কে না এক-আধবার উল্টে পড়ে, আছাড় খায়? আপনি হয়তো ছায়া-সোবার্সকে কাগজের সমতল থেকে না তুলে উপর-নীচে ঘুরিয়ে দিলেন! এবার

কী হল? ন্যাটা ছায়া-সোবার্স আর মোবিয়াস-রাজ্যে পঞ্চম টেস্ট ম্যাচটি খেলতে পারবেন না—কারণ আপনি তাঁকে ডানহাতি ব্যাটসম্যানে রূপান্তরিত করেছেন।



চিত্র—২২

এটা কেমন করে হল? ছায়া-সোবার্স তো একবারও তাঁর দ্বি-মাত্রিক ছায়া-জগৎ ত্যাগ করে বাইরে আসেননি? একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন—ছায়া তার দ্বি-মাত্রিক জগৎ ছেড়ে বাইরে আসেনি বটে কিন্তু সেই জগৎটাকে

আপনি—ত্রি-মাত্রিক জগতের মানুষ আপনি—একটি পাক দিয়ে দিয়েছিলেন কাগজটা সাঁটার আগে।

আমরা যে ত্রি-মাত্রিক জগতে অভ্যস্ত সেটাকে যদি চতুর্মাত্রিক কোন জীব চতুর্থ মাত্রায় একটা পাক দিয়ে দিতে পারত তবে আমরাও হয়তো অমন একটা ভূত-প্রেত প্ল্যানচেটের ভেঙ্কি দেখতে পেতাম—মহেশবাবুর মতো চিৎকার করে উঠতাম ‘হরিনাথ! আছে, আছে, সব আছে!’ অর্থাৎ চতুর্থ মাত্রার কিছুটা তির্যক আভাস পেতাম। তা যখন হচ্ছে না—তখন অন্য কিছু চেষ্টা করে দেখি।

আসুন এবার আমরা দেখি। ঐ ছায়াজীবদের কোন ঘন বস্তু সম্বন্ধে কতটা অবহিত করতে পারা যায়! ধরুন একটা স্বচ্ছ ‘ঘনক’ বা ‘কিউব’—লুডো খেলার



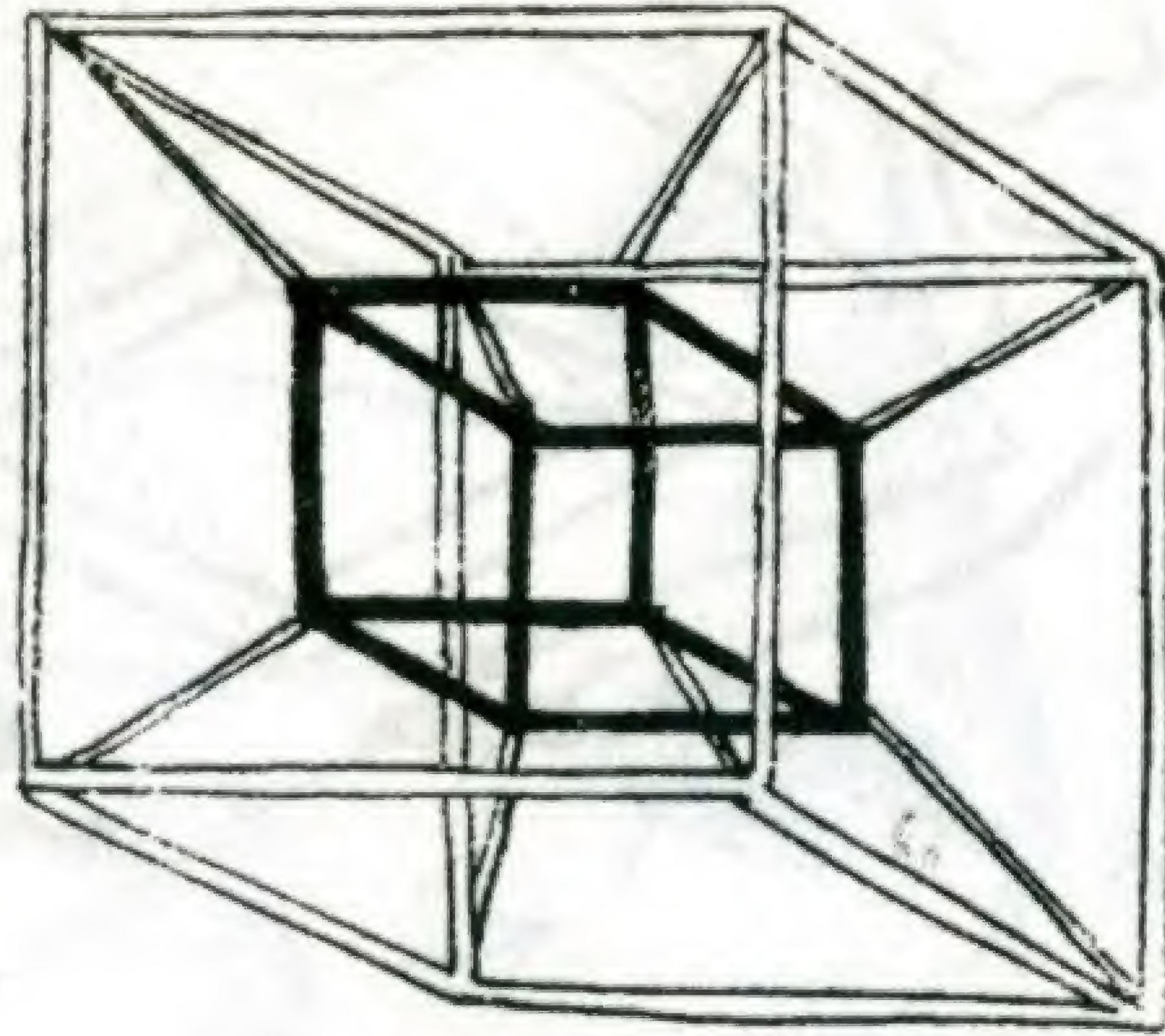
চিত্র—২৩

ছক্কা আর কি—কাগজের সমতল থেকে বাইরে না এনে ছায়াজীবদের কি-ভাবে তার স্বরূপটা বোঝানো সম্ভব? আপনি-আমি ত্রি-মাত্রিক জীব হিসাবে ওদের একটা সাহায্য করতে পারি—আলোর সম্মুখে স্বচ্ছ ঘনকটা ধরে সেটার ছায়া ওদের ছায়াজগতে অভিক্ষেপ (project) করতে পারি। চিত্র—২৩-এ অমন একটি ‘প্রজেকশান’ দেখা যাচ্ছে—একটি বর্গক্ষেত্রের ভিতর অপর একটি বর্গক্ষেত্র, যার শীর্ষবিন্দুগুলি যুক্ত।

ছায়াজীবেরা কি ঐ ছায়াটা দেখে বুঝতে পারবে লুডোর ছক্কা কী জাতীয় বস্তু? গতানুগতিক-ধর্মীরা পারবে না, আইনস্টাইন-জাতের যুথচ্যুতরা কিছুটা পারবে। বিশেষ, যদি আমরা তৃতীয় মাত্রায় ঘনকটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে ছায়াসম্পাত করি। ক্রমশ ছায়াজীবেরা লক্ষ্য করবে বস্তুটায় আটটা শীর্ষবিন্দু, ছয়টা তল, বারোটা ধার (edge),—লক্ষ্য না করলেও অনুমান করবে, কল্পনা করবে।

ঐ ‘অ্যানালজি’ থেকে এবার কল্পনা করুন—একটি চতুর্মাত্রিক মহা-ঘনক আমাদের সামনে উপস্থাপিত হলে আমরা কী দেখব! হতভাগ্য ছায়া-জীবেরা ত্রি-মাত্রিক ঘনককে দেখেছিল—একটা বর্গক্ষেত্রের পেটের ভিতর ছোট মাপের আর একটা বর্গক্ষেত্র। সেই অ্যানালজি ধরে বলা যায়, আমাদের চোখের সামনে একটা ‘চতুর্মাত্রিক মহা-ঘনক’ রূপায়িত হবে—একটি বড় ঘনকের পেটের ভিতর ছোট মাপের আর একটা ঘনক। অ্যানালজিটা মিলছে? ছায়াজীবদের ক্ষেত্রে ছোট মাপের বর্গক্ষেত্রের শীর্ষবিন্দু চারটির সঙ্গে বড় মাপের বর্গক্ষেত্রের চারটি শীর্ষবিন্দু সরল-রেখায় যুক্ত ছিল। সেই ‘অ্যানালজি’ ধরে চতুর্মাত্রিক মহা-ঘনকের যে প্রক্ষেপ আমরা আমাদের ত্রি-মাত্রিক দুনিয়ায় দেখতে পাব তার ভিতরের-ঘনকের সঙ্গে বাইরের-ঘনকের ধারগুলি যুক্ত থাকার কথা। জিনিসটা চিত্র—২৪-এর মতো হবে না কি?

আর একটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। ধরুন একটা কাঁচের গ্লোবে আমরা পৃথিবীর মানচিত্র আঁকলাম অনচ্ছ (opaque) রঙ দিয়ে। এবার আলোর সামনে সেই কাঁচের ভূ-গোলক বা গ্লোবটাকে ধরে তার একটি প্রক্ষেপ (projection) কোন দেওয়ালের উপর ফেললাম। ছায়াজীবেরা ঐ দেওয়ালের বাসিন্দা। তারা ঐ তিনমাত্রার পৃথিবীকে কতটুকু বুঝে নেবে? ওদের কিছু কিছু ধারণা বাস্তবের সঙ্গে মিলবে। যেমন, ওরা বুঝবে পৃথিবীটা গোল। তিন-মাত্রার ভূ-গোলক তো দুই-মাত্রার ম্যাপ বইতে আমরা গোল এঁকেই দেখাই। কিন্তু ওদের হয়তো ধারণা হবে—পিকিঙ আর নিউইয়র্ক দুটি পাশাপাশি শহর, যেন হাওড়া-কলকাতা। কিন্তু হলিউডকে মনে হবে কলকাতার উপকণ্ঠে (হায় কলকাতাবাসী! কেন তুমি ছায়াজীব হয়ে জন্মালে না!)। নিউইয়র্ক থেকে যদি একটি এয়ারোপ্লেন পিকিঙ-এ উড়ে যায় তবে ওরা তার প্রক্ষেপ দেখে মনে করবে প্লেনটি ম্যাপের কেন্দ্র-বিন্দু থেকে পরিধির বৃত্তটা ছুঁয়ে ঘরে ফিরল। আর প্লেন না হয়ে যদি একটা গুব্বের-পোকা



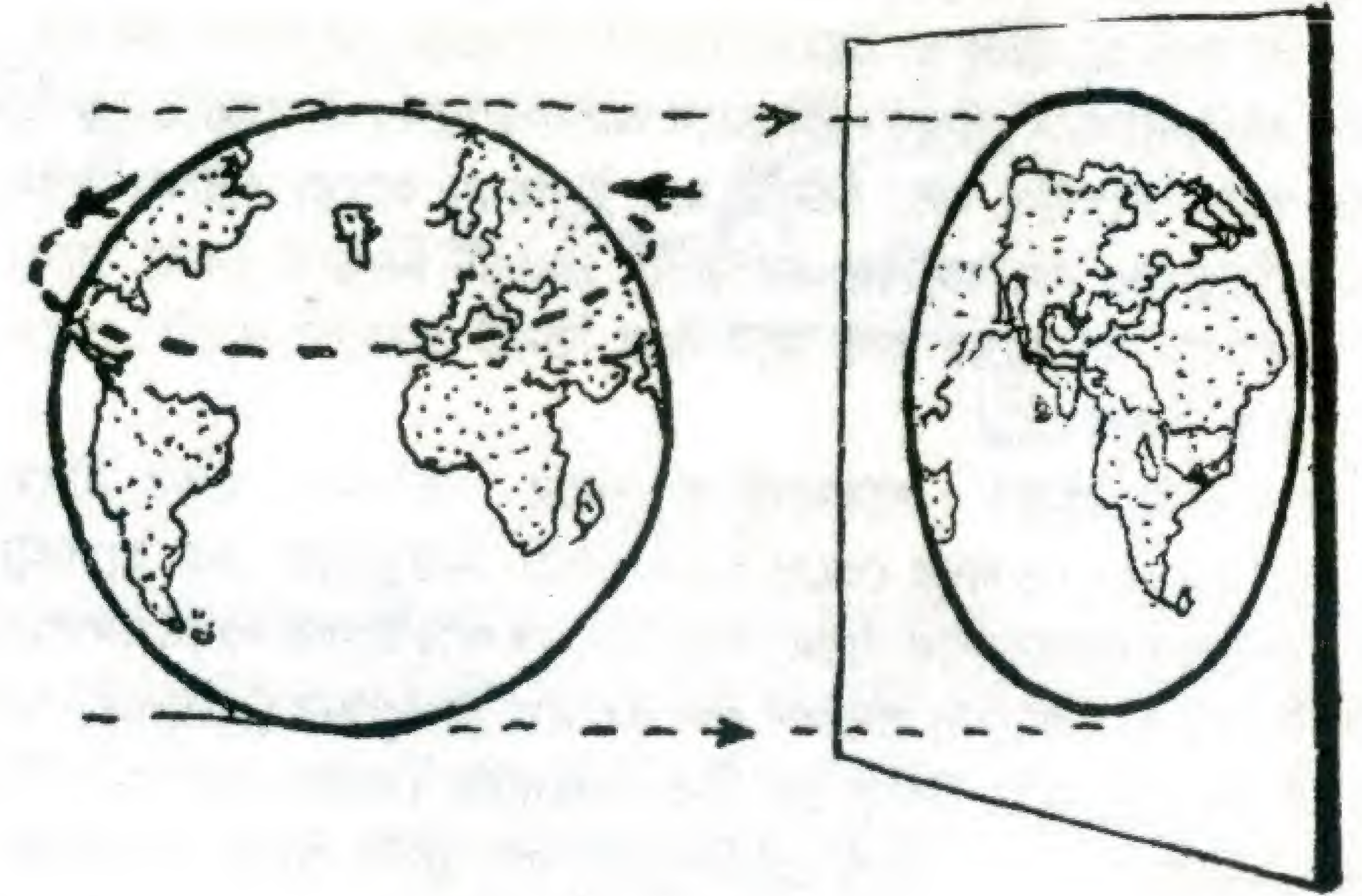
চিত্র—২৪

হবে—পিকিঙ আর নিউইয়র্ক দুটি পাশাপাশি শহর, যেন হাওড়া-কলকাতা। কিন্তু হলিউডকে মনে হবে কলকাতার উপকণ্ঠে (হায় কলকাতাবাসী! কেন তুমি ছায়াজীব হয়ে জন্মালে না!)। নিউইয়র্ক থেকে যদি একটি এয়ারোপ্লেন পিকিঙ-এ উড়ে যায় তবে ওরা তার প্রক্ষেপ দেখে মনে করবে প্লেনটি ম্যাপের কেন্দ্র-বিন্দু থেকে পরিধির বৃত্তটা ছুঁয়ে ঘরে ফিরল। আর প্লেন না হয়ে যদি একটা গুব্বের-পোকা

হয়? নিউইয়র্ক থেকে গোটা পৃথিবীটা ফুঁড়ে আট হাজার মাইল ভূগর্ভ পাড়ি দিয়ে যদি পিকিঙ-এ মাটি ভেদ করে ওঠে? তখন ওরা মনে করবে গুব্বের পোকাটা একই বিন্দুতে স্থির থেকে হাত-পা ছুঁড়ছে। তার আট হাজার মাইল ব্যাপী ভ্রমণটা তারা ধরতেই পারবে না (চিত্র—২৫)।

অ্যানালজিটা এবার চার-মাত্রায় কল্পনা করুন। ঐ যে অযুত-নিযুত গ্যালাক্সি সমন্বিত মহাকাশ, এর চতুর্মাত্রিক স্বরূপটা আমরা জানি না—তিনমাত্রায় এটাকে মহাকাশরূপে, মহাব্যোমরূপে কল্পনা করছি। অ্যানড্রোমেডা নীহারিকা থেকে আলোক-তরঙ্গ বিশ-লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্ব পাড়ি দিয়ে এল, মনে করছি সেটা সিধে-রাস্তায়, সরল রেখায় আসছে। তা তো নাও হতে পারে। হয়তো সে পথটা বাঁকা—চতুর্মাত্রিক মহাশূন্য যদি বন্ধিম হয়! কে জানে, ঐ বিশ লক্ষ আলোকবর্ষটাই নিকটতম দূরত্ব কিনা! একটু আগেই তো দেখেছি, নিউইয়র্ক থেকে প্লেনটা বিশ হাজার কিলোমিটার পথ উড়ে গিয়েছিল, ভূ-পৃষ্ঠের বন্ধিমতা স্বীকার করে—অথচ সেটাকে ছায়াবাসীরা ভেবেছিল বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত সরলরেখায় যাতায়াত। গুব্বের পোকাক ভূ-গোলক ভেদ করার ব্যাপারটা তো তারা ধরতেই পারেনি!

সেই অ্যানালজি থেকে কি মনে করতে পারি না—প্লেন যেমন গুব্বের পোকাক মতো মাটি ফুঁড়তে জানে না, জানে শুধু আপাত সরলরেখা ভ্রমণ করতে (যদিচ সে চলে ভূপৃষ্ঠের বন্ধিমতা স্বীকার করে বন্ধিম পথে), আলোকতরঙ্গও তেমনি



চিত্র—২৫

আমাদের কাছে আপাত সরলরেখায় চললেও আসলে চতুর্মাত্রিক বিশ্বে তাকে কোন বন্ধিম পথেই চলতে হয়? ভাষান্তরে বলা যায়, আলোকতরঙ্গ অ্যানড্রোমেডা নীহারিকা থেকে বিশ লক্ষ আলোকবর্ষ পথ পাড়ি দিয়ে আসে আসুক—কিন্তু কে জানে সেই চতুর্মাত্রিক বিশ্বে বিশেষ জাতের একটি গুব্বের পোকাক কাছে কোন শর্টকাট পথ আছে কিনা!

॥ চার ॥

আপেক্ষিকতাবাদের বাস্তব প্রমাণ

বেশ বোঝা যাচ্ছে আপেক্ষিকতাবাদের সূত্রগুলি হাতে-কলমে প্রমাণ করা খুব শক্ত। কেপলার-নিউটন-ম্যাক্সওয়েল-এর যে-সব সূত্র এতদিন অশ্রান্ত বলে মনে করা হত, আপেক্ষিকতাবাদের নিরিখে দেখছি সেগুলি একেবারে অশ্রান্ত নয়; তবে ভুল এত সূক্ষ্ম যে, জাগতিক ব্যবস্থায় ভ্রান্তিটা মেপে দেখানো খুব কঠিন। আমাদের সেই দেড়শ কেজি মেদের মৈনাক ঘণ্টায় পঁচিশ কিলোমিটার দৌড়েও তাঁর ওজন বৃদ্ধির এমন প্রমাণ দিতে পারেননি যা পার্থিব ওজন-দাঁড়িতে মেপে দেখানো যায়; আমাদের সেই জেট-প্লেনটা ঘণ্টায় ১২০০ কিলোমিটার বেগে ছুটিয়েও দেখেছি তার দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি এক মিটারের লক্ষভাগের কাছাকাছি যা ফুটরুলে মাপা যায় না। কিন্তু এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, কোটি কোটি কিলোগ্রাম ওজনের সূর্যনক্ষত্রের ক্ষেত্রে ঐ সূক্ষ্ম ভুলটুকুই উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠবে জ্যোতিষশাস্ত্রের অক্ষে।

আইনস্টাইন-উপস্থাপিত আপেক্ষিকতাবাদের ঐ সূত্রগুলিতে অক্ষের হিসাবে কোন ভুল ধরতে পারলেন না বিজ্ঞানীরা; কিন্তু যতক্ষণ না বাস্তব-প্রমাণে সূত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ সেগুলি মেনে নিতেও তাঁরা ইতস্তত করছিলেন। আগেই বলেছি, বাস্তব প্রমাণ ছাড়া বিজ্ঞানীরা সহজে কিছু মানতে প্রস্তুত নন। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে কী কাণ্ড হয়েছিল তা আমরা আগেই সবিস্তারে আলোচনা করেছি। এবার আমরা এই অনুচ্ছেদে দেখাব—কী ভাবে আইনস্টাইনের ঐ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবের বাস্তব প্রমাণ সংগৃহীত হল। তিনটি মাত্র উদাহরণ আমরা পরীক্ষা করব, তার প্রথম দুটি বুঝতে যদি অসুবিধা হয় তৃতীয় প্রমাণটি নিশ্চয়ই বোঝা যাবে। অক্ষে যাঁরা ভয় পান না তাঁদের কথা মনে করে তিনটি প্রমাণের কথাই এখানে একে একে তুলে দিলাম :

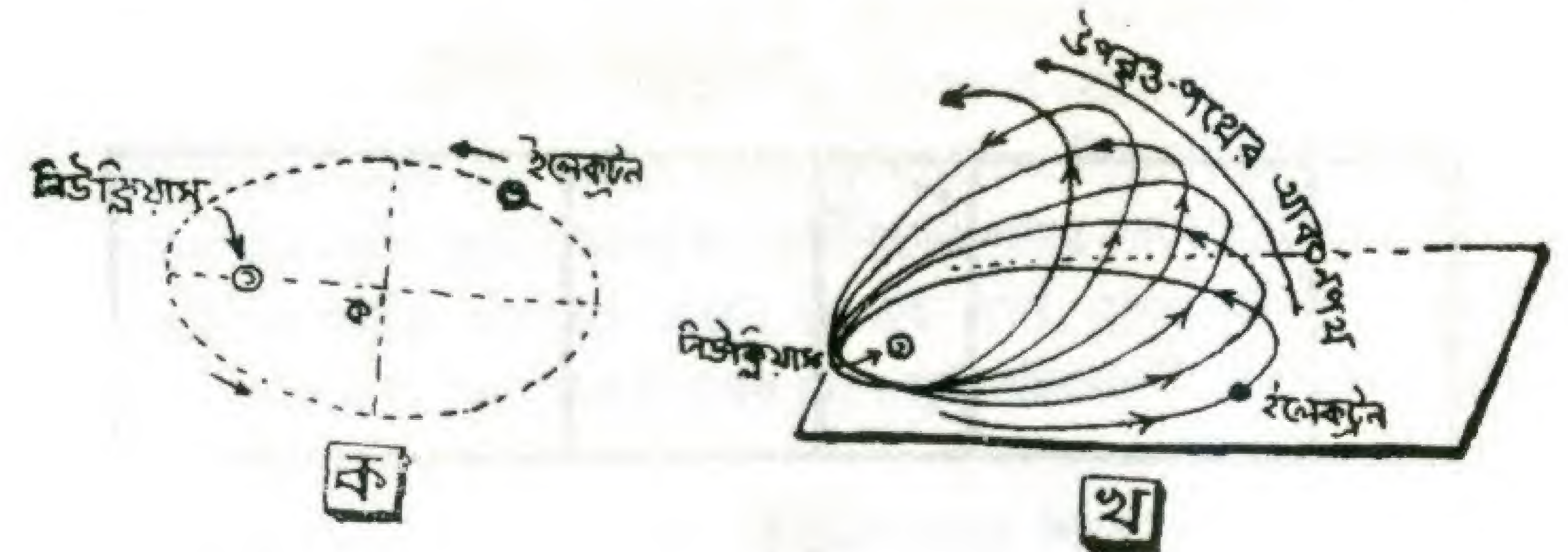
(ক) প্রথম প্রমাণ : পারমাণবিক ক্ষেত্রে : দিনেমার পণ্ডিত নীল্‌স্ বোর বললেন (১৯১৩) পরমাণুর কেন্দ্রে আছে একটি ‘নিউক্লিয়াস’ এবং ইলেকট্রনগুলি তার চারপাশে বৃত্তাকারে পাক খাচ্ছে। বছর-তিনেক পরে ইংরাজ পদার্থবিদ সমারফিল্ড প্রমাণ দিলেন ইলেকট্রনের প্রদক্ষিণ-পথ বৃত্ত নয়, উপবৃত্তের (ellipse) আকারে। আর ঐ নিউক্লিয়াসটা উপবৃত্তের ঠিক মাঝখানে (অর্থাৎ মেজর-অ্যাক্সিস ও মাইনর-অ্যাক্সিসের ‘ক’-চিহ্নিত ছেদবিন্দুতে) নয়, সেটি আছে উপবৃত্তের একটি ‘নাভি’তে অর্থাৎ focus-এ।

বস্তুত সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলিও ঐ উপবৃত্তের আকারে পাক খায়। সূর্য তাদের ঐ উপবৃত্তাকার প্রদক্ষিণ-পথের অন্যতম নাভিতে অবস্থিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমেই কেপলার প্রমাণ করেছিলেন—প্রতিটি গ্রহের সূর্য-প্রদক্ষিণের গতি সব সময় এক রকম নয়, বাড়ে কমে। কেপলার আরও বলেছিলেন, কোন একটি গ্রহের বার্ষিক গতির হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণটা নির্ভর করবে উপবৃত্ত পথটা কতটা

চ্যাপ্টা তার উপর—অর্থাৎ তার মেজর-অ্যাক্সিসের সঙ্গে মাইনর-অ্যাক্সিসের দৈর্ঘ্যের ফারাকের উপর। যেখানে ঐ দুটি অ্যাক্সিস-সমান, সেখানে উপবৃত্ত হয়ে যাবে নিটোল বৃত্ত—ফলে নাভিস্থিত সূর্য হয়ে যাবে বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুস্থ—সেই অবস্থায় বার্ষিক গতিতে কোন হ্রাসবৃদ্ধি হবেই না। যেমন ধরুন, আমাদের পৃথিবী—সে প্রায় একটি বৃত্তের আকারে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তাই তার গতির হের-ফের অতি সামান্য। সমারফিল্ড বললেন, ইলেকট্রন যেহেতু উপবৃত্তের আকারে নিউক্লিয়াস প্রদক্ষিণ করছে তাই তার গতির হ্রাস-বৃদ্ধি হবে।

আমরা আপেক্ষিকতা সূত্র (ii) থেকে জানি যে, গতির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে বস্তুর ভরও বৃদ্ধি-হ্রাস প্রাপ্ত হবে। উপগ্রহের গতি আলোর গতির তুলনায় সামান্য—তাই তার ভরের হ্রাস-বৃদ্ধি তেমন বোঝা যায় না; কিন্তু ইলেকট্রনের গতি অত্যন্ত বেশি, তাই তার ভরে কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি হবার কথা। মজা হচ্ছে এই যে, ‘ভর-এর কোনরকম হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে অক্ষশাস্ত্রমতে উপবৃত্তটা আর এক সমতলে থাকতে পারে না। গোটা উপবৃত্তটা যে সমতলে ঘুরছে সেই সমতলটাই তৃতীয় মাত্রায় ঐ নাভিকে প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য হবে। চিত্র ২৬/খ-তে দেখানো হয়েছে উপবৃত্তের সমতলটা সেক্ষেত্রে কীভাবে নাভিকে প্রদক্ষিণ করবে।

সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম : যদি পরীক্ষা করে বুঝতে পারি, ইলেকট্রনের



চিত্র-২৬

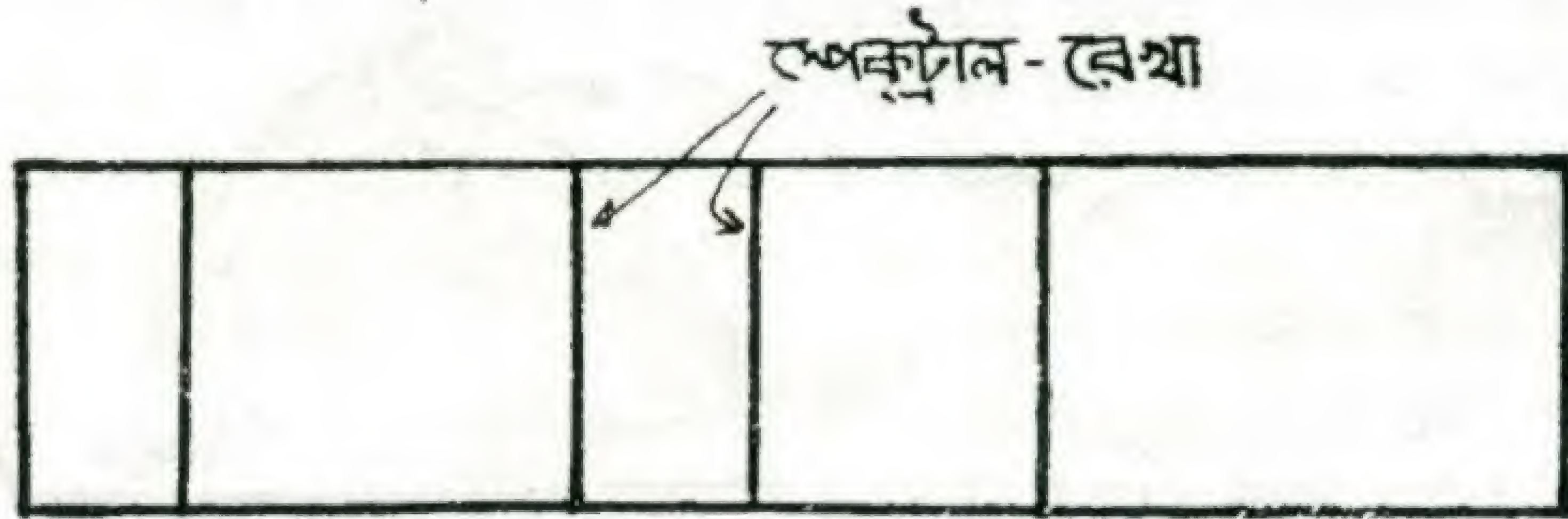
প্রদক্ষিণ-পথ সব সময়ে একই সমতলে আছে তবে বুঝতে হবে তার ভর অপরিবর্তিত থাকছে, আইনস্টাইনের ঐ দ্বিতীয় সূত্র মানছে না; আর যদি দেখি সেই সমতলটাই তৃতীয় মাত্রায় চিত্র-২৬/খ-এর মতো পাক খাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে যে, ‘ভর’-এ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটছে, অর্থাৎ আইনস্টাইনের সূত্র বাস্তব প্রমাণ দিচ্ছে। তা তো বুঝলাম, কিন্তু ইলেকট্রন যে অতি ক্ষুদ্র। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে আজও তাকে দেখা যায়নি, তার গতিপথের পরিবর্তন হচ্ছে কি হচ্ছে না কী করে বুঝব?

বিজ্ঞান সেই অসাধ্যসাধনও করল একদিন। না, ইলেকট্রনকে চোখে দেখা যায়নি আজও, কিন্তু তার গতি-প্রকৃতির হৃদিস পাওয়া গেছে। যে যন্ত্রের সাহায্যে পেল তার নাম ‘স্পেকট্রোস্কোপ’। যন্ত্রটা ঐক্কে দেখানোর প্রয়োজন নেই; তার কার্যকারিতার কথাটুকুই বলি :

একটা আতস-কাচ বা প্রিজম্-এর ভিতর দিয়ে যখন আমরা কোন সাদা

আলোকে যেতে দেখি তখন লক্ষ্য করি—সে সাতরঙা রামধনু বা বর্ণালী (spectrum) রচনা করেছে। আকাশে রামধনুও বর্ণালী, বাতাসে ভাসমান জলকণার প্রিজ্মে সূর্যের আলো সেখানে সাতটুকরো হয়ে যায়। সমারফিল্ড হিসাব করে দেখলেন যে, ইলেকট্রনের গতিপথ যদি এক সমতলের উপবৃত্ত হয়, তাহলে ঐ বর্ণালীতে কতকগুলি স্পেকট্রাল রেখা (spectral lines) দেখা যাবে। (চিত্র—২৭/ক); অপরপক্ষে উপবৃত্তের পথটা যদি তৃতীয় মাত্রায় চিত্র—২৬/খ-এর মতো পাক খেতে থাকে, তাহলে ঐ সরল রেখাগুলি দু-তিনটি ঘনসন্নিবিষ্ট সমান্তরাল রেখায় পরিণত হবে (চিত্র—২৭/খ)। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে একটি প্রবন্ধে সমারফিল্ড এই কথা বললেন যে, যদি স্পেকট্রোস্কোপে দেখা যায়—পরমাণুর ভিতর দিয়ে যাবার পথে আলোর বর্ণালীতে স্পেকট্রাল-রেখা দু-তিন টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে তখন বুঝতে হবে ঐ উপবৃত্ত-পথ তৃতীয় মাত্রায় ডিগ্বাজি খাচ্ছে। যার হেতু ইলেকট্রনের ‘ভর’ হ্রাসবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে; সোজা কথায় আইনস্টাইনের ঐ দ্বিতীয় সূত্রটি প্রমাণিত হচ্ছে।

কী অদ্ভুত যোগাযোগ দেখুন—ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের মাসখানেক আগে-পিছে পদার্থবিদ পাস্চেন (paschen) একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখলেন—তিনি হিলিয়াম পরমাণু (যাতে একটি মাত্র ইলেকট্রন) নিয়ে স্পেকট্রোস্কোপে পরীক্ষা



ক



খ

চিত্র—২৭

করছিলেন। সেই সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন—আলোর বর্ণালীতে স্পেকট্রাল-রেখা ঘন-সন্নিবিষ্ট কতকগুলি সমান্তরাল সরলরেখায় দু-তিন টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে।

এতদিনে বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেল আইনস্টাইনের সেই দু-নম্বর সূত্রটির

$$m_1 = m \div \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

(খ) দ্বিতীয় প্রমাণ : বুধ গ্রহের প্রদক্ষিণ-পথের সমাধান :

বুধ গ্রহের প্রদক্ষিণ-পথের একটা সমস্যা বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছিল। আগে সমস্যাটার কথা বলি :

বুধ গ্রহ সূর্যের সব চেয়ে কাছে, তার প্রদক্ষিণ-পথটা চ্যাপ্টা উপবৃত্ত আকারের (অর্থাৎ মেজর-অ্যাক্সিসটা মাইনর-অ্যাক্সিসের তুলনায় বেশ বড়)। আর দেখা গেছে যে, উপবৃত্তটা এক সমতলে নেই, চিত্র—২৬/খ-এর মতো উপবৃত্তটা তৃতীয় মাত্রায় পাক খাচ্ছে। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেভেরিয়ে (Leverria) ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন—বুধের এই বিচিত্র গতির একমাত্র কারণ হচ্ছে অন্য কোনও গ্রহের আকর্ষণ, যে গ্রহটি সূর্যের আরও কাছাকাছি আছে কিন্তু আমরা তার খবর রাখি না। বহু জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত তারপর সেই অজ্ঞাত গ্রহকে দূরবীন দিয়ে ধরবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। প্রসঙ্গত বলি, ঐ লেভেরিয়েই ইউরেনাস গ্রহের পথ পরিক্রমা বিচার করে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, ইউরেনাসের চেয়েও দূরে একটি গ্রহ আছে—যার ভর ‘এত’, যার দূরত্ব ‘এত’। সংখ্যাগুলো ঠিক ঠিক মেলেনি; কিন্তু সেই পথেই পরবর্তী গ্রহ নেপচুনকে একদিন ধরা দিতে হল দূরবীনে। শুধু তাই নয়,—কেন ঠিক ঠিক মিলল না সেই হিসাব কষতে গিয়ে মনে হল আরও একটি গ্রহ তাহলে আছে নেপচুনেরও পিছনে। সেই সূত্রেই ১৯৩০ সালে ধরা পড়ল প্লুটো। আজকের বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়তো প্লুটোর চেয়েও দূরে একটি গ্রহ আছে, যার নাম ‘এক্স’। সে যাই হোক, বুধের গতিপথের ঐ ধাঁধার কোন সমাধান হল না, যেহেতু বুধের চেয়ে সূর্য-সন্নিবিষ্টবর্তী কোন গ্রহের আবিষ্কার কেউ করতে পারল না।

তখন সকলের নজর পড়ল আইনস্টাইনের থিরোরির দিকে। ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে উপবৃত্ত-পথকে ঘুরতে দেখেছি এখানেও কি সেই কারণে বুধের পথ বিচিত্রগতি হচ্ছে? অঙ্ক কষে দেখা গেল খানিকটা তাই বটে। তবে সবটা সেজন্য নয়। বস্তুত অসঙ্গতির বাকিটুকুও ঘুচে গেল, আইনস্টাইনের ‘জেনারেল থিয়োরি’ ঘোষিত হবার পর। নিউটনের অভিকর্ষের মূল সূত্রটাকে আইনস্টাইন হিসাব করে সামান্য পরিবর্তন করেছিলেন। নিউটনের সূত্রটি ছিল:

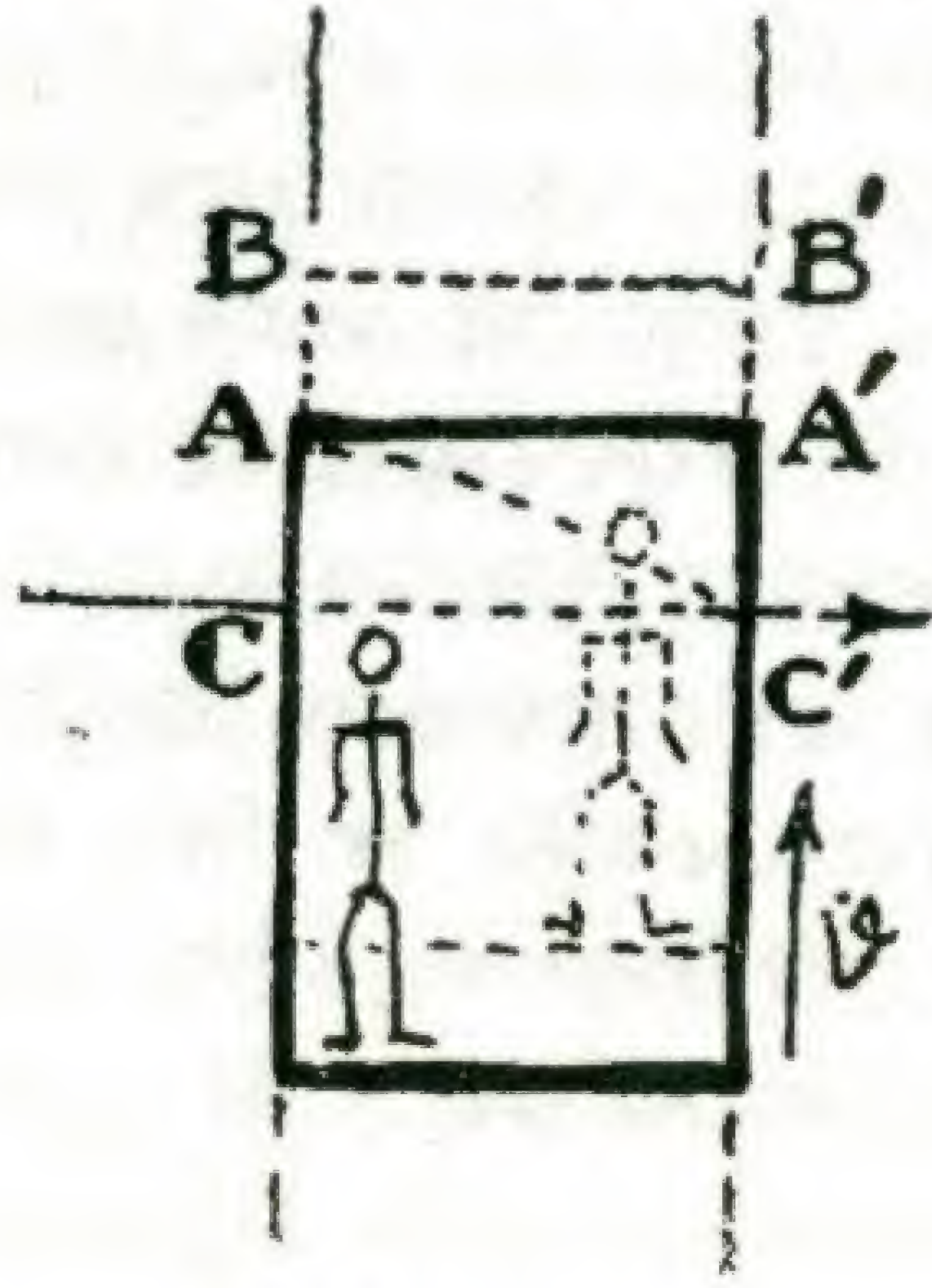
$$F = G \times \frac{mm}{d^2}$$

যেখানে F হচ্ছে অভিকর্ষের টান; G একটা ধ্রুবক সংখ্যা; m, m' হচ্ছে বস্তুদ্বয়ের ভর এবং d হচ্ছে তাদের মধ্যে দূরত্বের পরিমাণ। এই ফর্মুলা ধরেই এতকাল যাবতীয় অঙ্ক কষা হচ্ছিল। আইনস্টাইন বললেন—ঐ সূত্রে বর্গসূচক ঐ ২ সংখ্যাটাকে সামান্য পরিবর্তন করতে হবে। অঙ্ক কষে দেখালেন ওটা দুইয়ের পরিবর্তে হবে ২.০০০০০০১৬ অর্থাৎ সূত্রটি ঐ ফর্মুলায় ফেলে বুধের অঙ্কটা

আবার কথা হল—দেখা গেল, বুধ গ্রহের সব সমস্যা সম্পূর্ণভাবে ঘুচে গেছে।

$$F = G \times \frac{mm'}{d^{2.00000016}}$$

(গ) তৃতীয় প্রমাণ : সূর্যগ্রহণ ২৯শে মে, ১৯১৯ : এবার যে পরীক্ষাটির কথা বলব সেটি নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রমাণ করে দিল আইনস্টাইনের এক অত্যন্ত সিন্ধান্ত—যে কথা বিজ্ঞান কোনদিন চিন্তাই করেনি। আইনস্টাইনের সেই যুগান্তকারী ঘোষণাটি হচ্ছে ; আলোকরশ্মি যে কোন সাধারণ বস্তুর মতো; কোন বিশাল ভর-সম্পন্ন বস্তুর অভিকর্ষের ক্ষেত্রে আলোও বঙ্কিম পথে চলবে। যেন আলোক তরঙ্গের ভর আছে, ওজন আছে,—চলার পথে কোন অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্র পড়লে তার টান সে অনুভব করবে; তার পথ বঙ্কিম হয়ে যাবে। এই ধারণা



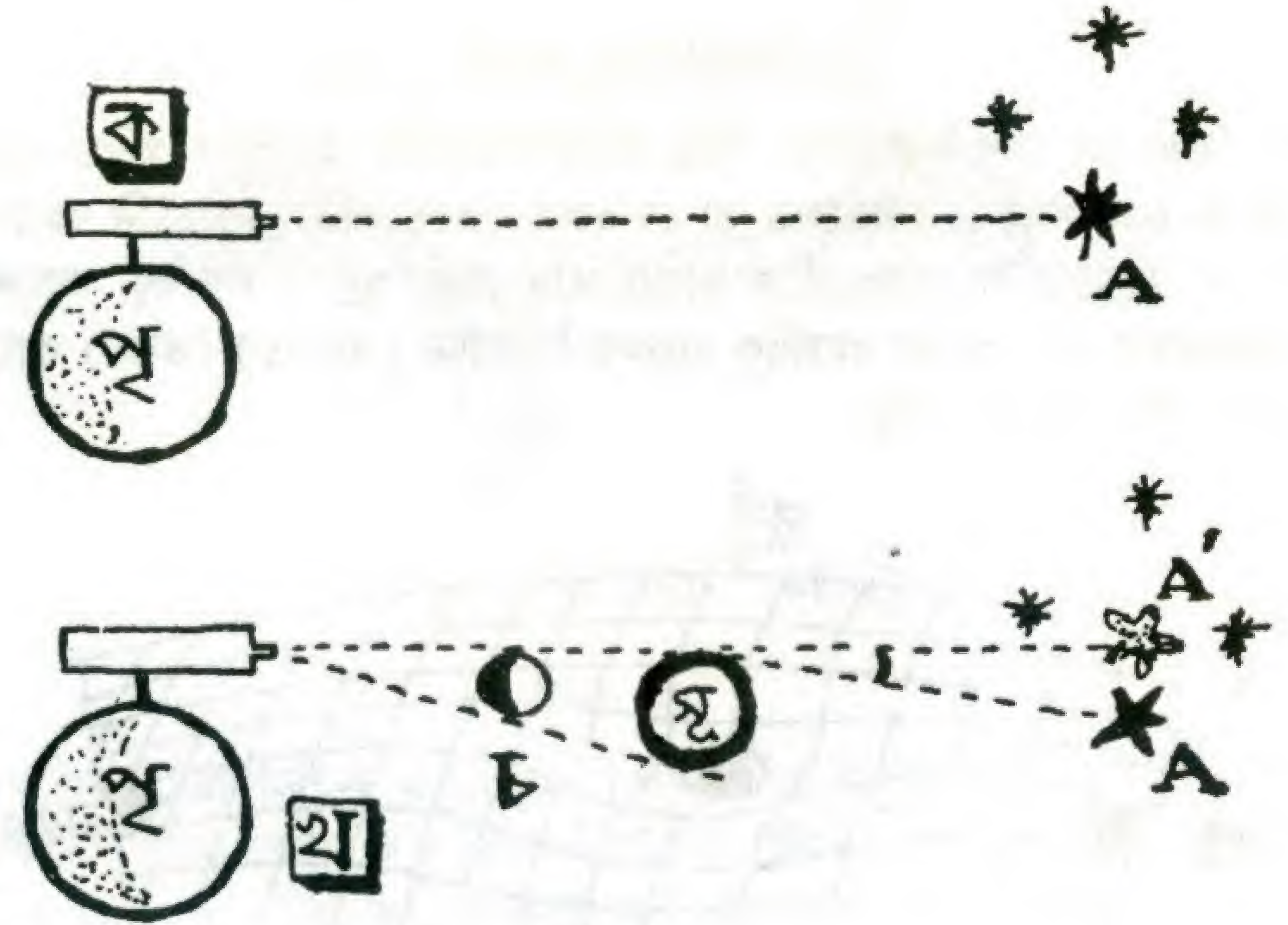
চিত্র-২৮

তদানীন্তন বিজ্ঞানের স্বীকৃত সূত্রগুলির পরিপন্থী। তাই এই বিপ্লবাত্মক কথাটা কেউ সহজে মানতে চাইলেন না। এমন একটা অদ্ভুত ধারণা কী করে ওঁর মনে উদয় হল সেটা আমরা একটা 'অ্যানালজি' দিয়ে বিচার করে দেখতে পারি : মনে করুন, একজন বিজ্ঞানী মহাশূন্যে একটি লিফ্টে করে V গতিতে উপরে উঠে যাচ্ছেন, কিন্তু তিনি তাঁর এই উর্ধ্বগতি সম্বন্ধে অনবহিত—কারণ আশপাশে কোন তথাকথিত স্থির বস্তু নেই। এখন ধরা যাক, চিত্র-২৮-এ যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি-ভাবে একটি বুলেট লিফ্টের ভূমির সঙ্গে

সমান্তরাল রচনা করে একটি সরল রেখায় এক পাশ দিয়ে ঢুকে অপর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বিজ্ঞানী লিফ্টের গর্ভে তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে মেপে কী বুঝবেন? তিনি মেপে দেখবেন, ঢোকার সময় ফুটোটা হয়েছে ছাদ থেকে AC দূরত্বে আর বের হবার সময় দূরত্বটা (যেহেতু তাঁর অজ্ঞাতসারে ইতিমধ্যে তিনি A' B' পরিমাণে উন্নত হয়েছেন) B'C'। তাঁর ধারণা হবে, বুলেটটা AC বঙ্কিমরেখায় লিফ্ট-এর ভিত্তাকার 'ঘটাকাশ' অতিক্রম করেছে। উনি সিদ্ধান্তে আসবেন—পৃথিবীতে আকাশে ঢিল ছুঁড়লে সেটা যেমন আকাশে একটি অধিবৃত্ত (parabola) রচনা করে, বুলেটটাও বোধহয় তাই করেছে। এখন যদি বুলেটের বদলে ওটা একটা আলোকরশ্মি হয়? আলোকরশ্মি অবশ্য অত্যন্ত জোরে যাবে, বুলেটের তুলনায়; কিন্তু V যে কত তা তো আমরা বলিনি। ফলে এবারও বিজ্ঞানী লক্ষ্য করতেন, আলোকতরঙ্গ তাঁর জগৎটা অতিক্রম করেছে একটি বঙ্কিমপথে। এবার হয়তো তিনি সিদ্ধান্ত করবেন যেহেতু $E=mc^2$ (মনে করা যাক বিজ্ঞানী আপেক্ষিকতাবাদের স্পেশাল থিওরি জানেন) এবং আলোকতরঙ্গ যেহেতু শক্তি তাই নিশ্চয়ই তার ভর আছে। ভর আছে বলেই বুলেটের মতো তার গতিপথ একইভাবে (যদিচ অনেক কম পরিমাণে) বেঁকে গেছে।

এই ধরনের তাত্ত্বিক 'অ্যানালজি' থেকে আইনস্টাইন তাঁর ঐ বিপ্লবাত্মক সিদ্ধান্তে এলেন। অঙ্ক কষে দেখলেন—তাঁর ধারণা (hypothesis) মিলে যাচ্ছে। তখন তিনি সম্পূর্ণ আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করলেন—আলোর 'ভর' আছে; আলোকতরঙ্গের উপরেও মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব পড়বে। বললেন, কোনও নক্ষত্রের আলো যখন সূর্যের কাছ ঘেঁষে যায় তখন তা বেঁকে যায়। এটা পরীক্ষা করা প্রায় অসম্ভব, কারণ সূর্যের কাছাকাছি নক্ষত্রের আলো তো দেখাই যাবে না—এটাও যেন সেই জাতের রসিকতা—“চোখ বুজলে—আহা! তোমার মুখখানা ঠিক যেন বাঁদরের মতো লাগে। আয়নায় দেখ'সে।”

কিন্তু তা কেন? সূর্যগ্রহণ যখন পূর্ণগ্রাস হয় তখন তো আকাশে তারা ফোটে। তেমন-তেমন পূর্ণগ্রাসে সূর্যের কাছ-ঘেঁষা নক্ষত্রও দেখতে পাওয়া যাবে। আইনস্টাইন ঐ কথা ঘোষণা করার পর হিসাবমতো দেখা গেল, অমন জাতের একটি পূর্ণগ্রাস পৃথিবীর কোন কোন স্থান থেকে দেখা যাবে ২৯শে মে, ১৯১৯ তারিখে। বিজ্ঞানীরা বললেন, তাঁরা এ-ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখবেন। আইনস্টাইন-প্রদত্ত ফর্মুলা তো পড়েই আছে। ওঁরা হিসাব কষে দেখলেন সেই অঙ্কের হিসাবমতো সূর্যের কাছ-ঘেঁষা



চিত্র-২৯

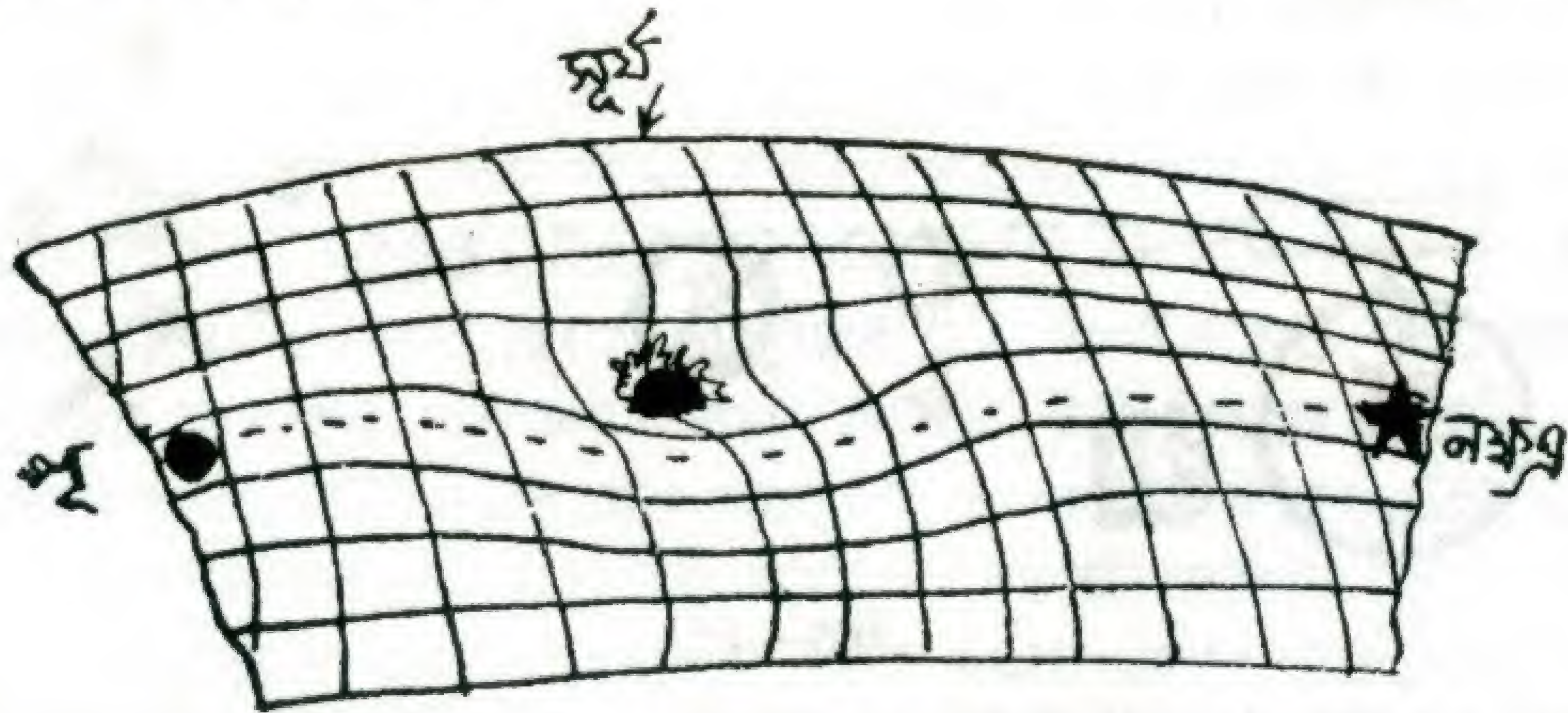
একটি নক্ষত্রের অপসারণ হবে ১.৭৫ সেকেন্ড (এখানে 'সেকেন্ড' সময়ের মাপ নয়, ডিগ্রি কোণের যাট ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এক মিনিট, তার যাট ভাগের এক ভাগ—সোজা কথায় এক সমকোণের ৩,২৪,০০০ ভাগের মাত্র এক ভাগ হচ্ছে 'কৌণিক মাপ এক সেকেন্ডে') সরে যাবে। দু'জন প্রখ্যাত ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী পৃথিবীর দু-প্রান্তে ঐ পরীক্ষাটা করতে বের হলেন। ক্রমেলিন-এর (crommeling) দল গেলেন ব্রেজিলে, আর এডিংটন (Eddington) সদলবলে গেলেন আফ্রিকার

গিনি উপকূলে। ওঁদের পরীক্ষাকার্যটা সংক্ষেপে চিত্র—২৯-এ বোঝানোর চেষ্টা করেছি। চিত্র—২৯/ক-তে দেখছি সূর্যগ্রহণের আগে বা পরে রাত্রে বেলায় A চিহ্নে নক্ষত্রটির অবস্থান (অন্যান্য নক্ষত্রের অবস্থিতির হিসাবে) লিখে রাখা হচ্ছে। চিত্র—২৯/খ-তে সূর্যগ্রহণের সময় দেখা গেল, A-চিহ্নিত নক্ষত্রটা যেন ঐ অন্যান্য নক্ষত্রের দিকে অর্থাৎ সূর্য থেকে দূরে সরে গেছে। ঐ A-চিহ্নিত নক্ষত্রের আলোকরশ্মি সূর্যের আকর্ষণে কী ভাবে বেঁকে গেছে তা চিত্রে দেখানো হয়েছে। এবার দর্শকের চোখে A-চিহ্নিত নক্ষত্রটিকে দেখা যাবে A'-অবস্থানে। ব্রেজিলের বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষায় দেখলেন নক্ষত্রটি এভাবে ১.৯৮ সেকেন্ড বেঁকেছে। এডিংটন দেখলেন, তাঁর যন্ত্রে নক্ষত্রটা ১.৬০ সেকেন্ড বেঁকেছে। দুটি পরীক্ষার গড় ফল তাহলে হল ১.৭৯ সেকেন্ড। আইনস্টাইনের হিসাব তো আগেই লিখে রাখা হয়েছিল—১.৭৫ সেকেন্ড। বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে যে কয়টি ভবিষ্যৎবাণী নাটকীয়ভাবে মিলে গেছে ঐ পরীক্ষাটি তার অন্যতম।

॥ পাঁচ ॥

মহাকাশের স্বরূপ

এ পর্যন্ত তো বেশ বুঝিলাম; কিন্তু আলোকতরঙ্গের ঐ বিচিত্র গতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আইনস্টাইন যা বললেন তা যে হজম করতে পারছি না। উনি বললেন, ঐ যে আলোর গতিপথ বেঁকে যাচ্ছে তার হেতু শুধু এ নয় যে, আলোক তরঙ্গভঙ্গিমা নয়, আলো বাস্তবিক বস্তুকণা—‘ফোটন’, যার ভর (ওজন) আছে; বরং আসল হেতুটা হচ্ছে :

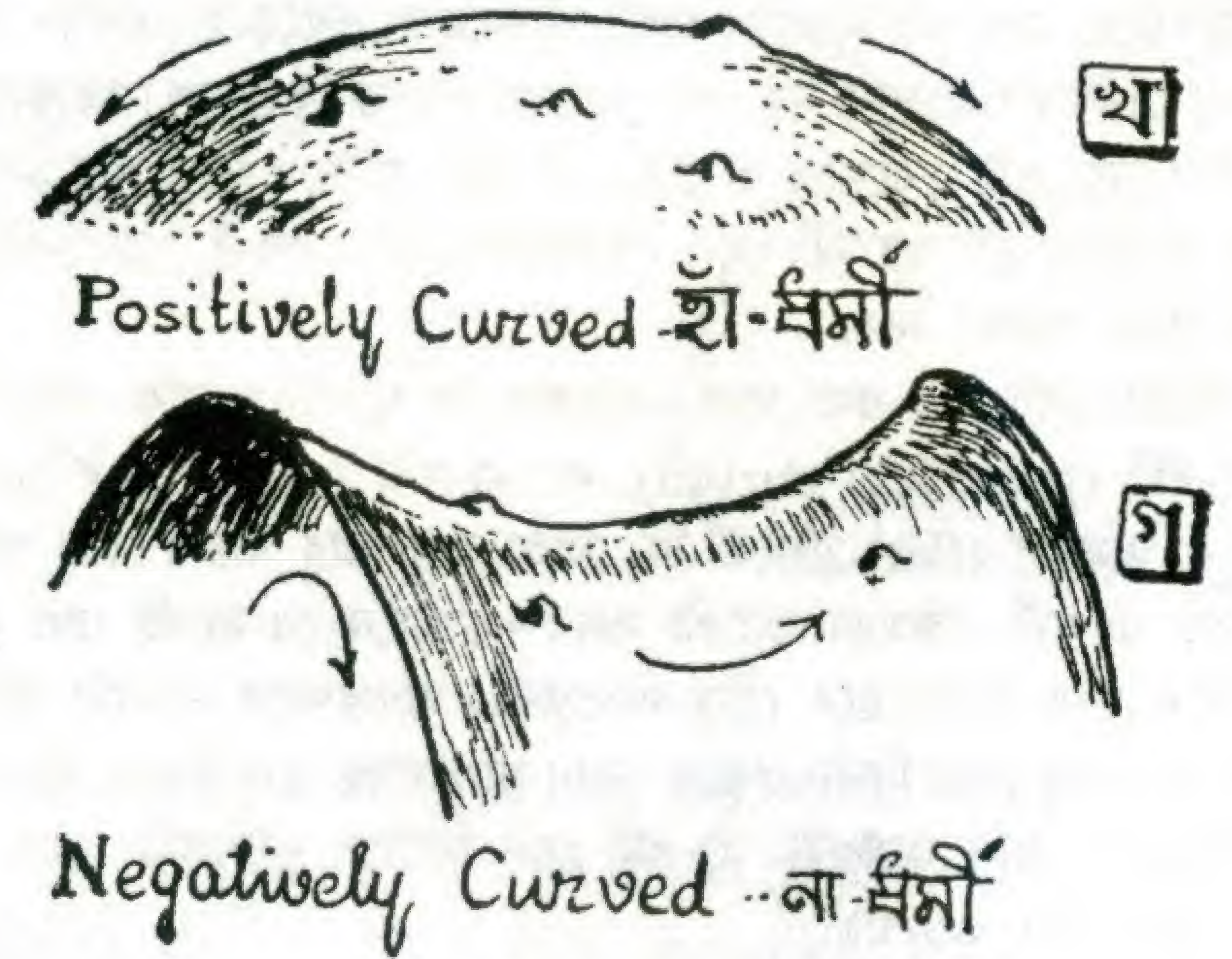
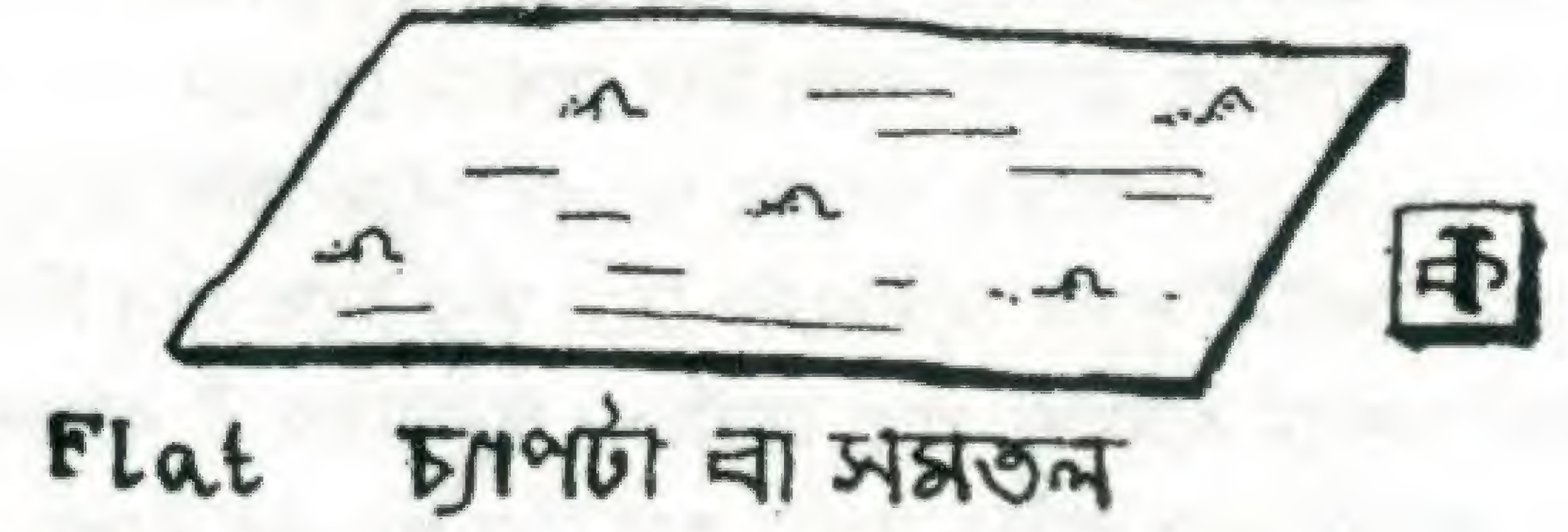


চিত্র—৩০

অভিকর্ষের নিয়ম যেটাকে বলছি, সেটা বস্তুত ঐ চতুর্মাত্রিক বিশ্বব্যাপারের—ঐ স্থান-কাল-সংপৃক্তির একটা ব্যঞ্জনা। সংক্ষেপে পূর্ণ সত্যটা ঐ : ব্রহ্মাণ্ড সান্ত কিন্তু অসীম।

দাঁড়ান মশাই! মাথাটা গুলিয়ে গেল। হেতু যেটা বাতলালেন সেটা শুধু ‘ভরে’ ভারী নয়, গালভারী শব্দসম্ভারে গুলায়িত! এ যেন হিংটিংছটের সেই ছন্দ-বদ্ধ সূত্রটা : “ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট!”

সোজা কথায় ব্যাপারটা কী দাঁড়াল বুঝিয়ে বলুন দেখি :



Negatively Curved না-ধর্মী

চিত্র—৩১

অভিকর্ষ, মাধ্যাকর্ষণ বা ‘Law of Gravitation’ ব্যাপারটার ঠিকমতো পরিচয় নিউটনের আমল থেকে কেউ দিতে পারেননি। তার কার্যপ্রণালীর হিসাব-নিকেশ শুধু জানা গেছে; কিন্তু মূল ব্যাপারটা নয় অর্থাৎ অভিকর্ষ ‘কী’, ‘কেন’ জানা যায়নি—তার প্রভাবের ফলাফলটুকুই শুধু বুঝতে পারা গিয়েছিল। তোমাকে টানতে হলে আগে তোমার হাতটা বা ঠ্যাঙটা চেপে ধরতে হবে, নিদেন তোমার শাড়ির প্রান্ত বা চাদরের খুঁটে গাঁটছড়া বাঁধতে হবে; বড়জোর ল্যাসো ছুঁড়ে তোমাকে টেনে আনতে পারি; কিন্তু মহাশূন্যে অবস্থিত সূর্য কেমন করে ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটোর মতো দূরে অবস্থিত বস্তুকে বিনা ল্যাসোয় টানছে? তাছাড়া কেনই বা টানছে? নিউটন এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি।

আইনস্টাইন বললেন, এটা কোন টানাটানির ব্যাপারই নয়—সূর্য অভিকর্ষের টানে পৃথিবীকে টানছে বলেই পৃথিবী ক্রমাগত তাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে, এ

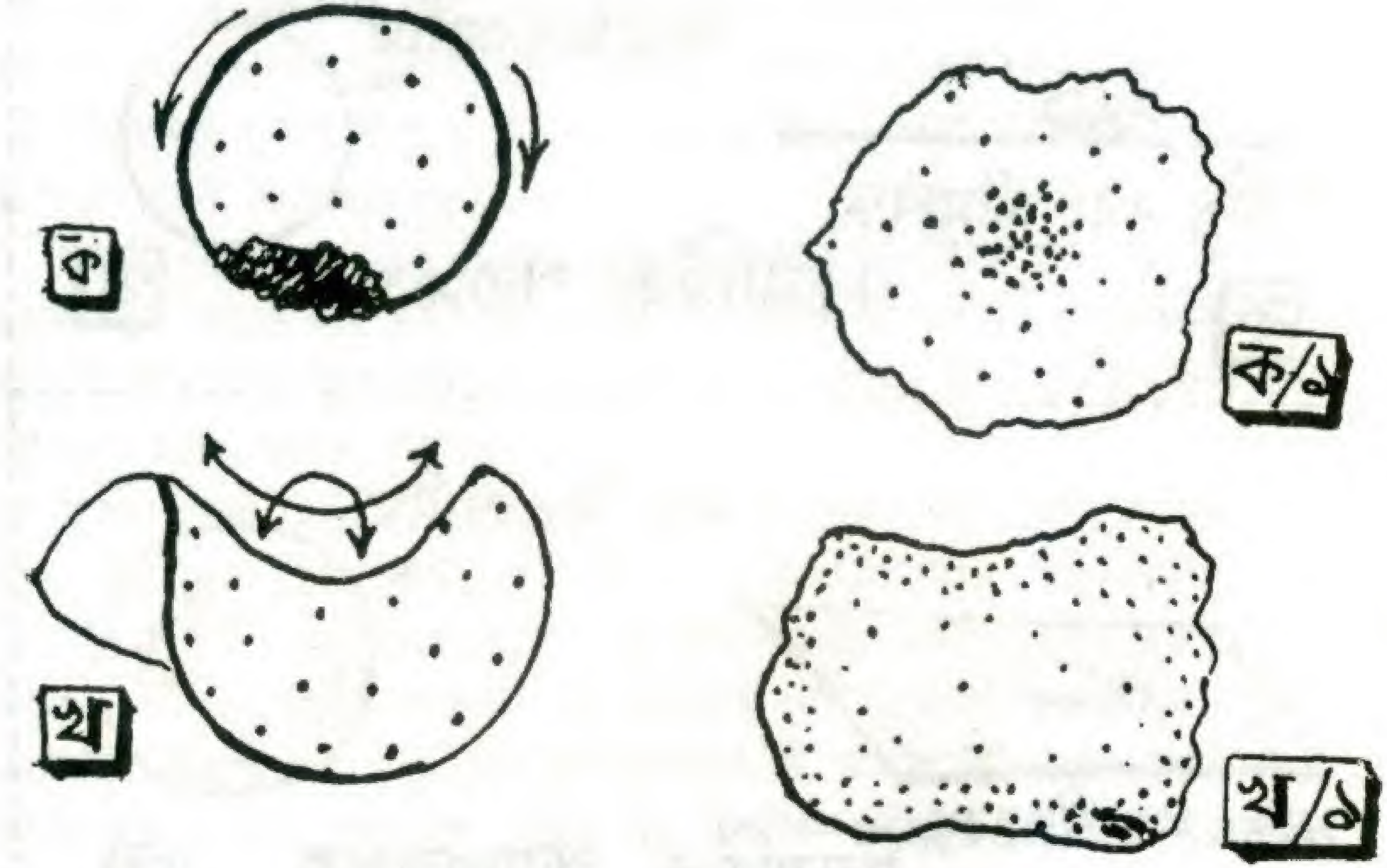
ধারণাই ভুল। আসলে সূর্যের ভর তার সন্নিকটস্থ স্থান-কাল-সংপৃক্ত বিশ্বকে বাঁকিয়ে দিচ্ছে; আর সেই বক্রিম মহাকাশে পৃথিবীর ঐ ভাবে চলা ছাড়া গতানুগতিক নেই। বিশালাকার নক্ষত্র বা সূর্যের ভর-জনিত কারণে মহাকাশ কীভাবে বাঁকে তার ধারণা করা যাবে যদি দীর্ঘ সমুদ্র-সৈকতে জোয়ারের পরে কী দেখেছেন মনে করেন। জোয়ারের জল সরে গেছে—সমুদ্র-বেলাভূমি মসৃণ, সমতল; কিন্তু যেখানে যেখানে কোন বড় পাথর বা ডাবের খোলা ছিল সেখানে সেখানে যেন কিছু গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। চিত্র—২৯/খ-তে নক্ষত্রের আলোর পথ যে বঁকে গেল তার কারণ শুধু এ নয় যে, আলোর ‘ফোটন’ সূর্যের অভিকর্ষের টানে তার দিকে সরে গিয়েছিল—বরং বলব, মহাকাশই ওখানে বক্রিমতা প্রাপ্ত হয়েছিল। চতুর্মাত্রিক ঐ ব্যাপারটা দু-মাত্রার কাগজে ঐক্কে দেখালে তার প্রতীক রূপটা হবে চিত্র ৩০-এর মতো।

সোজা কথায় দাঁড়াল—মহাকাশে যেখানে যেখানে বড় বড় নক্ষত্র আছে, গ্যালাক্সি আছে, সেখানেই মহাকাশ একটু বঁকেছে বা তুবড়েছে। এখানে ‘মহাকাশ’ মানে শুধু স্থানবাচক মহাশূন্য নয়, স্থান-কালের সংপৃক্ত বিশ্বাকাশ। মহাকাশের তো উপর-নীচ নেই, তাই তুবড়েছে বা টোল খেয়েছে না বলে ফুস্কুড়ির মতো ফুলে উঠেছে বললেও ভুল হয় না। যেন মহাকাশের গালে ব্রণ-র চিহ্ন দেখা গেছে। মহাকাশ আর ‘অব্রণ’ নন!

আঞ্চলিক ব্রণচিহ্নের কথা থাক—মহাকাশ কি চ্যাপটা? নাকি বক্রিম? বক্রিম হলে হাঁ-ধর্মী (positively curved), না, না-ধর্মী (negatively curved)? চ্যাপটা বা সমতল (flat) বলতে কি বোঝা যায় তার ধারণা করা শক্ত নয়। তথাকথিত হাঁ-ধর্মী বক্রিমতা তাকেই বলব—যেখানে যে-মুখেই যাও না কেন একই দিকে বাঁক নিতে হবে (চিত্র—৩১/খ)। অপরপক্ষে না-ধর্মী বক্রিমতলে কোন্ দিকে বাঁকছ সেটা নির্ভর করবে ‘কোন্ মুখে যাচ্ছ’ তার উপর। বাগাড়ম্বরের চেয়ে উদাহরণ বেশি কার্যকরী। হাঁ-ধর্মী যেন নিটোল ফুটবলটি; আর না-ধর্মী ঘোড়ার জিন (চিত্র ৩১/গ)।

ঐ হাঁ-ধর্মী এবং না-ধর্মী বক্রিমতার একটা বৈশিষ্ট্যের কথা এই ফাঁকে বলে রাখি, কারণ পরবর্তী আলোচনায় সেটা কাজে লাগবে। ধরা যাক, একটি হাঁ-ধর্মী ফুটবলের গায়ে এবং একটি না-ধর্মী ঘোড়ার জিনের গায়ে সম-দূরত্বে আমরা কতকগুলি ফুটকি-চিহ্ন ঐক্কে দিলাম (চিত্র—৩২/ক এবং ৩২/খ)। এবার ঐ ফুটবল আর জিনের এক-একটা চাকলা কেটে নিয়ে কর্তিত অংশ টিপে-টুপে ঠেলে-ঠেলে সে দুটিকে সমতল দ্বি-মাত্রিক আকারে রূপান্তরিত করলাম। সেক্ষেত্রে আমরা দেখব ফুটবলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রস্থলে ফুটকির ভিড় জমেছে এবং সীমান্তের দিকে তাদের ভিড়টা কম (চিত্র—৩২/ক।১)। অপরপক্ষে ঘোড়ার জিনটাকে চ্যাপটা করে ফেলে দেখব ভিড়টা সীমান্তের কাছাকাছিই বেশি—মাঝখানটায় ফুটকির ভিড় পাতলা (চিত্র—৩২/খ।১)। এমন একটা অদ্ভুত পরীক্ষা কেন করলাম সে-কথায় পরে আসছি, আপাতত দেখি—ঐ যে আইনস্টাইন বললেন, ‘বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সান্ত কিন্তু অসীম’ তার মানে কী?

এক্ষেত্রেও কয়েকটি উপমা বা ‘অ্যানালজি’ নিয়ে অগ্রসর হলে ব্যাপারটা সহজে মগজে ঢুকবে। চিত্র—৩৩-এ আমরা পর পর তিনটি প্রতীক-ব্রহ্মাণ্ড ঐক্কেছি, একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক এবং ত্রিমাত্রিক। একটি ছায়াজীব ছারপোকাকে ঐ কল্পিত দুনিয়ায় ছেড়ে দিয়ে বলেছি ছারপোকাকার কাছে তার দুনিয়া কখনও সান্ত কখনও অনন্ত; কখনও সীমাবদ্ধ কখনও অসীম। আসুন, একে একে ঐ দার্শনিক চিন্তাগুলি



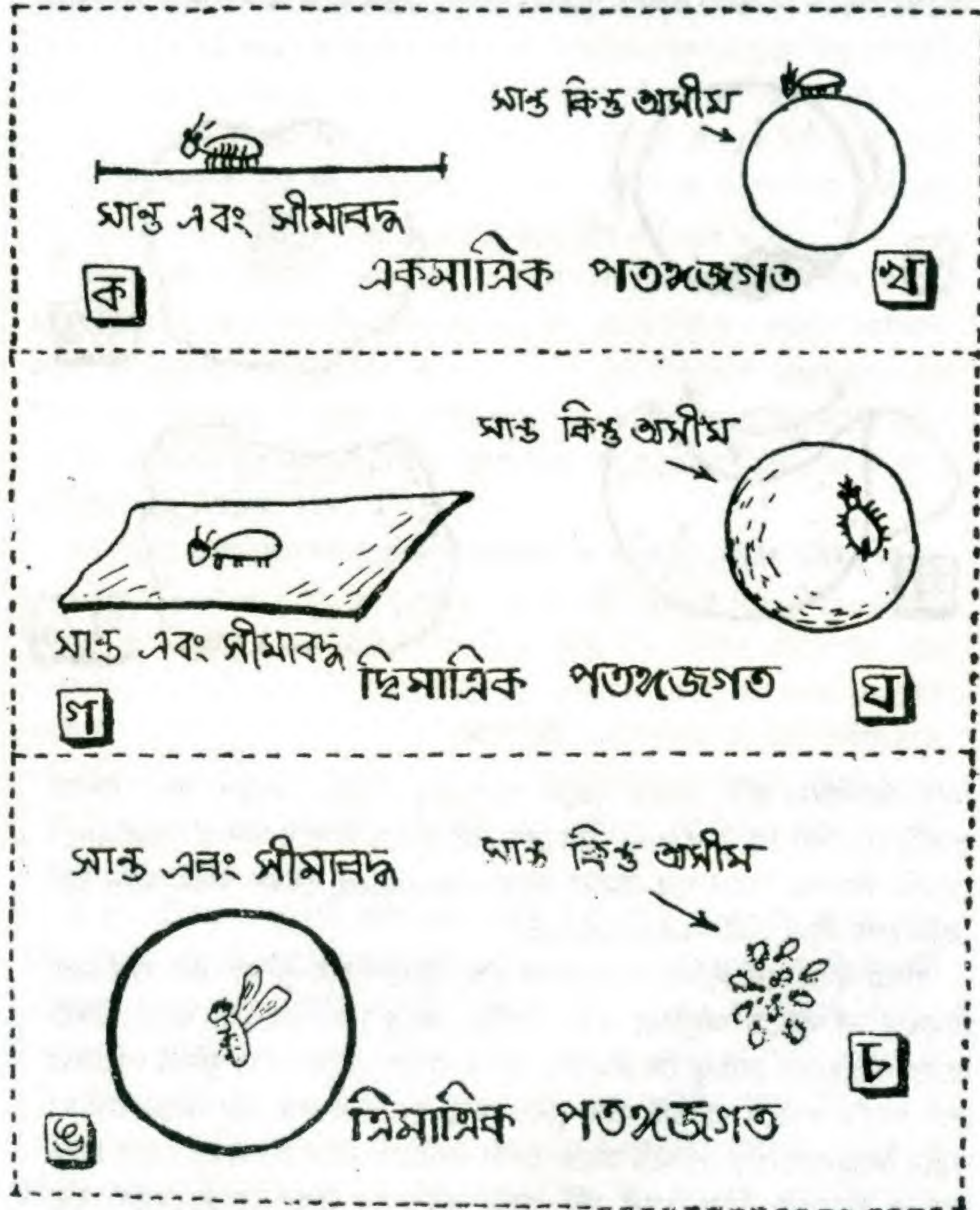
চিত্র—৩২

নিয়ে আলোচনা করি; অর্থাৎ ‘হেলে’ ধরে হাত পাকাই। প্রথমত ‘সান্ত’ বলতে বুঝেছি যার শেষ আছে—finite, যার শেষ নেই তা সে-হিসাবে ‘অনন্ত’—infinite। তেমনি ‘সীমাবদ্ধ’ অর্থে যার সীমানা আছে—bounded; যেমন অসীম মানে যার কোন শেষ সীমা নেই—unbounded।

প্রথম উদাহরণে, সীমিত সরলরেখায় (ক) ছারপোকাকার দুনিয়া কেন সান্ত এবং সীমাবদ্ধ তা বুঝতে অসুবিধা নেই। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (খ) পোকাকাটা আছে একটি বৃত্তের পরিধিতে। যেহেতু সে ক্রমাগত পরিধি বরাবর হেঁটেও তার দুনিয়া পরিক্রমা শেষ করতে পারবে না তাই তার দুনিয়া সান্ত হওয়া সত্ত্বেও তার কাছে অসীম। তৃতীয় উদাহরণে (গ) পোকাকাটা আছে একটা ফুলক্ষেপ কাগজের উপর। তার জগৎ সান্ত ও সীমাবদ্ধ; কিন্তু তাকে যদি একটা ফুটবলের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় (ঘ) তখন তার জগৎ সান্ত হলে সীমাবদ্ধ হবে না। এবার আসুন ত্রি-মাত্রিক জগতে। পোকাকাটিকে এবার (ঙ) একটা মৌমাছি বা মাছিরূপে কল্পনা করা উচিত; কারণ তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ফুটবলের ভিতরকার ত্রি-মাত্রিক ‘ঘটাকাশে’। যেখানে পোকাকাটা শুধু ডাইনে-বামে সামনে-পিছনে নয়, উপর-নীচেও যেতে পারছে। কিন্তু ফুটবলের বাইরে যেতে পারছে না। বর্তমান উদাহরণে (ঙ) মাছিটার

জগৎ সান্ত এবং সীমাবদ্ধ। এবার শেষ উদাহরণ, চিত্র—৩৩/চ।

মনে করুন, এক ঝাঁক মৌমাছিকে আমরা শূন্য ছেড়ে দিয়েছি—‘শূন্য’ বলতে মহাব্যোম, ‘ঘটাকাশ’ নয়। আরও মনে করুন, প্রতিটি মৌমাছির ‘ভর’ অত্যন্ত বেশি। তাহলে কী হবে? যেহেতু ওদের ভর (mass) অতি-বিশাল, তাই ওদের



চিত্র-৩৩

পারস্পরিক অভিকর্ষ-জনিত আকর্ষণ হবে অত্যন্ত তীব্র—ওরা প্রায় জড়াজড়ি করে থাকবে। কোন একটি মৌমাছি দল ছেড়ে দূরে যেতে চাইলেও পারবে না। তাছাড়া কোন আলোকতরঙ্গও ওদের সেই ভিড় ছেড়ে বাইরে যেতে পারবে না—

অভিকর্ষের টানে দলের দিকেই সেই আলোকতরঙ্গ ফিরে আসবে। ফলে মহাশূন্যের দিকে তাকালেও ওদের দৃষ্টিতে শুধু নিজেদের আকৃতিই ধরা পড়বে। অঙ্ক কষে দেখানো যায় যে, সূর্যের আয়তনের সমান—অর্থাৎ সূর্যের মতো বড় কোন নক্ষত্রের ভর যদি সূর্যের চার-লক্ষ গুণ হয় তাহলে তার অভিকর্ষের টান এত বেশি হবে যে, নক্ষত্রের আলোকরশ্মির ‘ফোটন’-নক্ষত্র ছেড়ে বার হতে পারবে না। অমন একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র যদি সৌরমণ্ডলে এসে পড়ে, তবে আমাদের সৌরমণ্ডল হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু নক্ষত্রের আলোটা আমরা আদৌ দেখতে পাব না। সে কথা যাক, যে আলোচনা হচ্ছিল—সুতরাং ঐ শেষ পর্যায়ে (চ-অবস্থায়) মৌমাছিগুলির দুনিয়া বাস্তবে অসীম (boundless) হওয়া সত্ত্বেও তাদের মনে হবে যে, সেটা সান্ত (finite)।

‘হেলে’ ধরা শেষ হয়েছে। এবার ‘কেউটে’—অর্থাৎ চতুর্মাত্রিক স্থান-কাল-সংপৃক্তি ধরতে হবে। ধরতে পারছেন? ঐ যে আইনস্টাইন নামক সাপুড়ে সেই কালনাগিনীর নৃত্যছন্দ অনুধাবন করে বললেন, চতুর্মাত্রিক বিশ্ব ‘সান্ত কিন্তু অসীম’ তার অর্থ বোধগম্য হল? আমার তো হল না!

বাস্তব ধারণা (physical conception) না হলেও অ্যানালজি থেকে এটুকু বুঝেছি যে, আমাদের অবস্থা, ঐ ঘ-চিত্রের পোকাটির মতো—আমরা যেন এই ত্রি-মাত্রিক পৃথিবীতে ছায়া-সোবার্দের অবস্থায় পড়েছি। ছায়া-সোবার্দের শুধু দু-মাত্রা চেনে—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ। তাকে যদি ভূ-গোলকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেই ত্রি-মাত্রিক ভূ-গোলকে (globe) ছায়াজীবটির কী অবস্থা হবে! সে উত্তর মেরু থেকে নাক-বরাবর দক্ষিণমুখো চলতে শুরু করলে—গতিমুখ পরিবর্তন না করেও দক্ষিণ মেরু পার হয়ে ক্রমশ ফিরে আসবে তার যাত্রারপ্তের সেই আমড়াতলার মোড়, অর্থাৎ উত্তর মেরুতেই। কেন, কেমন করে এটা হচ্ছে তা সে বুঝবে না।

ঐ ‘অ্যানালজি’ থেকে আইনস্টাইনের মতানুযায়ী বলা যায়, পৃথিবী থেকে একটি আলোকতরঙ্গ বা বেতারতরঙ্গ সোজাপথে চলতে থাকলেও স্থান-কাল-সংপৃক্তির এই সান্ত-অসীম জগৎ-ব্যবস্থায় সেটা ফিরে আসবে এই পৃথিবীতেই—কারণ বিশ্বপ্রপঞ্চ সীমাহীন হলেও অনন্ত নয়।

কিন্তু একটা কথা। ছায়াজীব উত্তর মেরু থেকে রওনা হয়ে এমন একটা বিন্দুতে পৌঁছেছিল (দক্ষিণ মেরু) যেটা তার যাত্রারপ্তের স্থান থেকে সবচেয়ে দূরে। অ্যানালজি অনুসারে তাহলে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও তেমন একটা দূরতম বিন্দু থাকার কথা, পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে। ভাষান্তরে ব্রহ্মাণ্ড যদি অনন্ত না হয়, তবে তার একটা নির্দিষ্ট ‘ব্যাস’ আছে। এবং যেহেতু ব্রহ্মাণ্ড ‘সান্ত’ তাই সে ব্যাসটি অনন্ত হতে পারে না—সংখ্যার দ্বারা তাকে প্রকাশ করতে পারা উচিত। এই প্রশ্নটি যখন পেশ করা হল আইনস্টাইনের কাছে, তখন তিনি বললেন, বটেই তো! অঙ্ক কষে দেখছি—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্ধ হচ্ছে 2×10^{20} মাইল।

জানি না, এ-কথা শুনে আপনাদের কী প্রতিক্রিয়া হল—আমার তো মনে পড়ে গিয়েছিল সেই গোপালভাঁড়ের হিসাবের কথা। ‘গোপাল, আকাশে কত তারা আছে বলতে পার?’ ‘আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ, পারি—পাঁচ হাজার বত্রিশ কোটি তিনশ একটি—বিশ্বাস না হয় শুনে দেখুন!’ এক্ষেত্রেও কি ঘোষণাটা এই জাতের?

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেলিস্কোপে (পালোমার জ্যোতির্বিজ্ঞানাগারে অবস্থিত—আইনস্টাইন যখন সংখ্যাটা ঘোষণা করেন তখন সেটার পয়দা হয়নি।) এক বিলিয়ান আলোক-বর্ষ পর্যন্ত দেখা যায়। এক বিলিয়ান মানে একশ কোটি। কিন্তু বিজ্ঞানীরাই বলছেন, এই পরিদৃশ্যমান মহাব্যোম গোটা মহাব্যোমের একটি ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ মাত্র—কতটা অংশ তা তাঁরা জানেন না। তাহলে ঐ অঙ্কটা আইনস্টাইন কয়লেন কেমন করে?

ওঁর কষা অঙ্কটা বুঝবার চেষ্টা করেছি। হাতির গুঁড়ের মতো চিহ্নগুলির কথা বাদ দিয়ে মোদা ব্যাপারটা বার্ট্রান্ড রাসেল যেভাবে বুঝিয়েছেন সেটা বুঝে নেবার চেষ্টা করা যাক :

কোপারনিকাসের আমল থেকেই একটা ধারণা বিজ্ঞানীরা পোষণ করতেন যে, মহাবিশ্বে এই যে গ্যালাক্সিগুলি ছিটানো আছে এগুলির ভিড় মোটামুটি একরকম অর্থাৎ কলকাতায় যেমন মানুষের ভিড় আর গ্রামাঞ্চলে লোকের বাস কম—তেমনটি নয়, সর্বত্রই ভিড়টা প্রায় একজাতের। বিজ্ঞান এটাকে বলেছে ‘Cosmological Principle’ বা ‘মহাজাগতিক ধর্ম’। তা থেকে এ কথা পর্যন্ত নাকি বলা যায় যে, প্রতি ঘনমিটার মহাব্যোমে গড়ে একটি করে পরমাণু আছে। এ থেকে মহাব্যোমে অবস্থিত যাবতীয় গ্যালাক্সির গড় ঘনত্বের (density) একটা পরিমাপ পাওয়া যায়; গড় আয়তনেরও। ফলে যাবতীয় গ্রহ-নক্ষত্র গ্যালাক্সির গড় ‘ভর’ কত এবং তা কত গড় দূরত্বে আছে তারও একটা আন্দাজ মেলে। যেহেতু ইতিপূর্বেই সূর্যগ্রহণের পরীক্ষার সময় আমরা দেখেছি—সূর্যের পরিচিত ভরের আকর্ষণে মহাকাশ (স্থান-কাল-সংপৃক্তি) কতটা বাঁকে, ফলে অঙ্ক কষে বার করা যায় পুরোপুরি এক পাক অর্থাৎ ১৮০° বাঁক খেতে কতটা ভরের প্রয়োজন। সেটা জানা হলে মহাজাগতিক ধর্মের গড় থেকে এটাও হিসাব করে বার করতে পারব যে, কতটা মহাকাশের স্থান সেজন্য প্রয়োজন। ঐভাবেই অঙ্কটা কষা হয়েছিল। Estimate-কে আমরা বাঙলায় ‘প্রাক্কলন’ বলি। Guess-কে বলি আন্দাজ; বিজ্ঞানীরা ঐ estimate শব্দটি এক্ষেত্রে ব্যবহার করেননি। গ্যামো বলেছেন, “The radius of the universe was guesstimated as 2×10^{23} miles”! বাঙলায় কী বলব? মহাব্যোমের ব্যাসার্ধের পরিমাণ ‘প্রাকান্দাজিকলন’-এর হিসেবে — ২×১০^{২৩} মাইল? অঙ্কের হিসাব যাই বলুক—আমার মনটা কেমন যেন খুঁত খুঁত করছে; মাত্র তেইশটা শূন্য! পুরো দু-ডজনও নয়? এই যে অযুত-কোটি নক্ষত্র দিয়ে গাঁথা গজমোতির মালা গ্যালাক্সি, এরা নাকি লক্ষ-কোটি আলোকবর্ষ ব্যবধানে সব সাজানো—অমন বিশ-পঁচিশ-পঞ্চাশটা মালা নিয়ে হয় একটা শতনরী, সহস্র-নরী, যাকে বলি ‘ক্লাস্টার অব গ্যালাক্সিজ’ বা গ্যালাক্সি-গুচ্ছ। শুনেছি, কোটি কোটি আলোক-শতাব্দীর ব্যবধানে কোটি কোটি গ্যালাক্সি-গুচ্ছ বক্ষে ধারণ করেছেন মহাকাশ! সেই মহাব্যোমের ব্যাসার্ধ মাত্র তেইশটা শূন্যে প্রকাশযোগ্য? তাও আলোকবর্ষ নয়, মাইল-এ।

কিন্তু দাঁড়ান। আগে বুঝে নিই সংখ্যাটা কত বড়। কোটি লিখতে প্রয়োজন হচ্ছে আটটা শূন্যের। গোটা পৃথিবীর জনসংখ্যা পরিমাপ করতে ঐ আটটা শূন্যই যথেষ্ট। তাহলে তেইশটা শূন্য দিয়ে গাঁথা সংখ্যাটা কত বড়? আপনারা উজির

শিসাবেন দাহির এবং নবাব শিরহাম-এর সেই গল্পটা শুনেছেন? উজীর শিসাবেন অঙ্ক গুলে খেয়েছেন—দাবাখেলাটা নাকি তাঁরই আবিষ্কার। নবাবকে ঐ খেলাটা শিখিয়ে দেওয়ায় নবাব খুশি হয়ে বললেন, বল তুমি কী পুরস্কার চাও?

উজির আঁকে দড়। ছোট্ট একটি প্যাঁচ কয়লেন। বললেন, কী আর দেবেন জাঁহাপনা, গরিবকে কয়েক মুঠি গমের দানা দিতে বলুন। আমার এই দাবার ছকে গুনতি করে কিছু গমের দানা সাজিয়ে দেবার হুকুম হোক। প্রথম ঘরে একটি দানা, দ্বিতীয় ঘরে দুটি, তৃতীয়ে চারটি, চতুর্থে আটটি, পঞ্চমে ষোলোটি—এই ভাবে ডবল করতে করতে চৌষট্টিখানা ঘর পূর্ণ করে দিতে বলুন।

নবাব মনে মনে বললেন, আহা! উজির বেচারী অঙ্কটাই শিখেছে, দর্শনটা বোঝে না! ‘নাঙ্গে সুখমস্তি’ মন্ত্রটাও জানে না। মুখে বললেন, তথাস্তু।

কিন্তু ঐ হিসাবে গম দিতে গিয়ে রাজকোষ ফক্বা! রাজ্য লাটে উঠল!

কী ব্যাপার? ব্যাপার কিছুই নয়—সোজা অঙ্কের হিসাব। স্কুল-জীবনে অঙ্কের মাস্টারমশাই যেদিন গুণোত্তর শ্রেণীর অঙ্ক শিখিয়েছিলেন—জি. পি.-র অঙ্ক আর কি—সেদিন যদি ক্লাস পালিয়ে না থাকেন তবে হয়তো মনে পড়বে অল্পে-সস্তুষ্ট উজিরসাহেবের ঐ বিদুরের খুদের পরিমাণটা এইভাবে পাওয়া যাবে :

$$1+2+2^2+2^3+2^4+2^5+\dots+2^{62}+2^{63}+2^{64}-1$$

$$=18, 446, 744, 073, 709, 551, 615.$$

সংক্ষেপে মোটামুটি ‘দুই’ এর পরে উনিশটি শূন্য।

তার অর্থ—আইনস্টাইন-ঘোষিত সংখ্যাটা এই সংখ্যার প্রায় দশ হাজার গুণ!

মানছি, উজিরসাহেবের ঐ উনিশটি শূন্যওয়ালা সংখ্যাটিও বড় কম নয়। বৈজ্ঞানিক জর্জ গ্যামো হিসাব কষে বললেন, সারা বছরে আজ গোটা পৃথিবীতে যত দানা গম উৎপন্ন হয় ঐ সংখ্যাটি তার দুই হাজার গুণ। যেহেতু গম উৎপাদনের হার ইদানীং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়েছে তাই অনায়াসে বলা চলে—মানবসভ্যতার উষাযুগ থেকে আজ পর্যন্ত যত দানা গম এই পৃথিবীতে মানুষ উৎপন্ন করেছে সংখ্যাটা তার চেয়েও বড়। মানছি, মশাই, মানছি—তবু কেমন যেন একটা খুঁতখুঁতানি থেকে যায়। জর্জ গ্যামো নয়, মনে পড়ে ওয়াডসওয়ার্থের কথা—Is this Yarrow!

॥ ছয় ॥

মহাব্যোমের সম্প্রসারণ

সুখের বিষয়—নূতন একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হবার পর আইনস্টাইন নিজেই বললেন, তাঁর ঘোষিত ঐ সংখ্যাটিকে সেক্ষেত্রে বাতিল বলে ধরতে হবে। বাঁচলাম! স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল আমাদের। তেইশটি শূন্যওয়ালা ঐ সঙ্কীর্ণ আকাশের চার-দেওয়াল আবার ধসে গেল—এতক্ষণে যেন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছি। কিন্তু নয়া আবিষ্কারটা কী জাতের?

স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্রটির সঙ্গে ইতিপূর্বেই আমাদের জান-পহ্ছান হয়েছে। পদার্থ-বিজ্ঞানী তাঁর ল্যাবরেটোরিতে বারে বারে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, আলোর উৎসটা যদি স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্র থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে বর্ণালীটা লালের প্রান্ত ঘেঁষে আসে। আবার আলোর উৎস যদি যন্ত্রের দিকে এগিয়ে আসে তাহলে বর্ণালীটা অপর প্রান্তে, অর্থাৎ বেগুনের দিকে সরে যায়। এই ডানে বাঁয়ে সরে যাওয়ার পরিমাণটা মেপে অঙ্ক কষে বলে দেওয়া যায় আলোর উৎস কত বেগে এগিয়ে আসছে, অথবা পেছিয়ে যাচ্ছে।

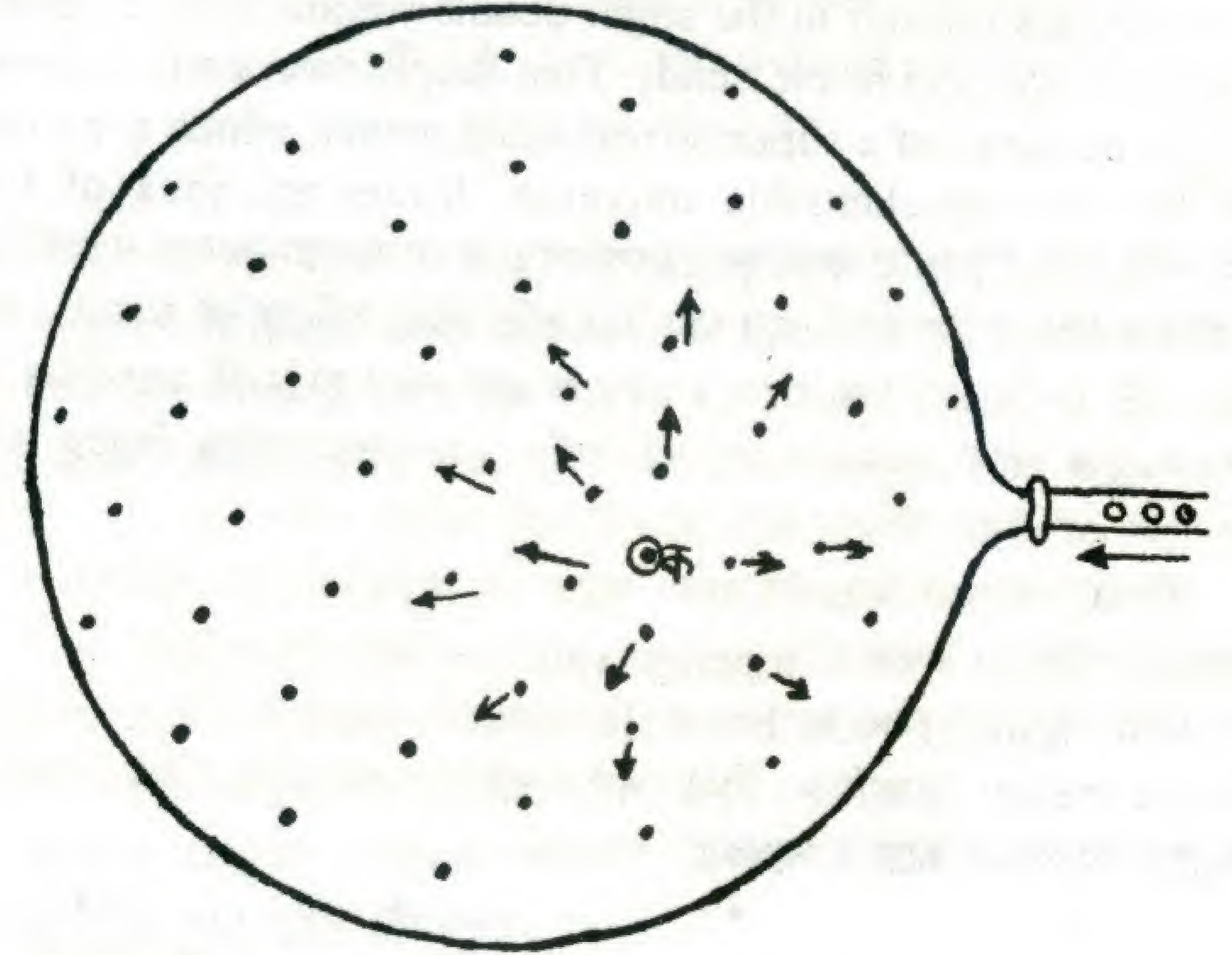
জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বললেন—প্রতিটি গ্যালাক্সি থেকে যে আলোক-তরঙ্গ পৃথিবীতে এসে পৌঁচাচ্ছে তা প্রায় সবই ঐ লালের দিকে সরে যেতে চায়। তার অর্থ মহাকাশের প্রতিটি গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রগুচ্ছ আমাদের সৌরমণ্ডল তথা আমাদের গ্যালাক্সি থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। আমাদের সব চেয়ে কাছে যে গ্যালাক্সি গুচ্ছ আছে—যা প্রায় চার কোটি আলোকবর্ষ দূরে—তার অগ্রসরণের গতি প্রতি সেকেন্ডে ১২০০ কিমি। আরও অদ্ভুত কথা, যন্ত্রে দেখা যাচ্ছে—যে যত দূরে সে তত জোরে পিছনে হটছে। যাটের দশকে মহাবিশ্বের শেষ সীমান্তে—অর্থাৎ দূরবীনে দেখা মহাকাশের শেষ দিগন্তরেখার কাছাকাছি—কতকগুলি অতিকায় বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছিল। সেগুলি দানব তারকার চেয়েও লক্ষ লক্ষ গুণ ভারী। তাদের নাম ‘কোয়াসার’ (কোয়াসিস্টেলার)। স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্র বলছে তাদের পশ্চাদ-পসরণের গতি আলোর গতির প্রায় আধাআধি।

কেন এমনটা হচ্ছে? আগেই বলেছি—এই পৃথিবী, তথা সৌর-মণ্ডল কিম্বা আমাদের ছায়াপথে ঘেরা পরিচিত গ্যালাক্সি মহাব্যোমের কেন্দ্রবিন্দুতে নেই। বস্তুত বিশ্বের কোন কেন্দ্রবিন্দুতেই নেই। তাহলে এমনটা কেন দেখছি? বসানো তুবড়ি থেকে বিচ্ছুরিত আলোর ফুলকি যে-যেদিকে ইচ্ছে ছুটে যায় কিন্তু সকলেরই গতিমুখ তুবড়ির বিপরীত দিকে। তুবড়ি ঐ আপাত-বিশৃঙ্খল ইতস্তত-ছোট আলোর ফুলকিগুলির সঙ্গে একই সম্পর্কে আবদ্ধ—সে তাদের কেন্দ্রস্থলে। পৃথিবী তো তা নয়।

বিজ্ঞানীরা বললেন, এখানে উপমাটা ‘ঠিক কালিদাসস্য’ ধাঁচের হল না। বসানো তুবড়ির বিচ্ছুরণ নয়। তুলনা করতে হবে বেলুনের সঙ্গে। তবেই উপমান আর উপমেয় প্রায় খাঁজে খাঁজে মিলে যাবে। বেলুন? বেলুন কেন?

বিজ্ঞানীরা বললেন, মনে কর এই মহাব্যোম যেন একটা ফোলানো রবারের বেলুন। তার গায়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত—মোটমুটি সম-দূরত্বে (কস্মলজিকাল প্রিন্সিপল বা মহাজাগতিক ধর্মে) আঁকা অসংখ্য গ্যালাক্সির ফুটকি। এবার মনে কর, কোন অলক্ষ্য বংশীবাদক ফুঁ দিয়ে ঐ বেলুনটাকে ফোলাচ্ছেন। তাহলে কি হবে? (চিত্র—৩৪)। বেলুনের গোলক-এ কোন কেন্দ্রবিন্দু নেই। ধর আমরা ‘ক’ বিন্দুতে আছি। আমরা মনে করব—প্রত্যেকটি বিন্দু আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। হাঁ-ধর্মী কিম্বা না-ধর্মী বক্ষিম-জগৎকে চেপটে সোজা করলে (চিত্র—৩২) যেমন ভাবে হত তেমন ভাবে নয়—ভিড়টা সর্বত্র সমান ভাবে পাতলা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু

ঐ ‘ক’ বিন্দু তো যে কোন একটা বিন্দু হতে পারত। অর্থাৎ যে কোন গ্যালাক্সি থেকে মনে হত প্রতিবেশীরা তাকেই কেন্দ্র করে যেন দূরে সরে যাচ্ছে। আসলে কেউই রাগ করে দূরে সরে যাচ্ছে না, যে বেলুনের গায়ে তাদের আঁকা হয়েছে সেই তলটাই আয়তনে বাড়ছে বলে এমনটা মনে হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি গ্যালাক্সি থেকে মনে হবে ঐ মহাব্যোমে দু-জাতের গ্যালাক্সি আছে—‘আমি’ আর



চিত্র—৩৪

‘ওরা’। আমি কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির আছি, আর ওরা সবাই দূরে সরে যাচ্ছে—বসানো তুবড়ি থেকে যেমন আলোর ফুলকি চতুর্দিকে ছুটে যায়। প্রত্যেকটি গ্যালাক্সির ব্যাকরণে থাকবে দুটি পুরুষ। ‘অহং’ এবং ‘তে’। উত্তম পুরুষ এবং প্রথম পুরুষ। অহংকারের বারুদ দিয়ে ঠাসা ‘আমি’-তুবড়ি জানতেও পারবে না—‘আমি’ এবং ‘ওরা’ ছাড়াও কেউ থাকতে পারে—তিনি ঐ বংশীধারী, যিনি বেলুনটাকে ফোলাচ্ছেন। তিনি ‘অহং’-ও নন, ‘ওরা’ও নন—তিনি ‘ত্বমসি’!

উপমাটা কিন্তু এখনও ‘কালিদাসস্য’ হয়নি। বেলুনের উদাহরণে প্রতিটি বিন্দুরই মনে হবে অন্যান্য প্রত্যেকটি বিন্দু একই গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে—বেলুনের তল সর্বত্রই একইভাবে বাড়ছে, ফলে কাছেই থাক আর দূরেই থাক অন্যান্যদের দূরে সরে যাওয়ার গতিবেগ একই রকম লাগবে। স্পেকট্রোস্কোপ তা বলেনি। বলেছে, যে যত দূরে সে তত জোরে পিছু হটছে। মহাজাগতিক ধর্ম অনুসারে সবাই বোধ হয় তাই দেখছে। তার মানে আমরা যে ত্রিমাত্রিক বেলুনের উদাহরণটা নিয়েছি চতুর্মাত্রিক-বিশ্বে সেটা হুবহু মেলেনি, মেলার কথাও নয়। এ থেকে এটুকুই বুঝলাম—যা শিখেছি তাও বাহ্য! ‘আগে কহ আর’। জিজ্ঞাসাটা যেমন ছিল

তেমনই রইল। অবাঙ্মনসগোচর যেমন ছিল তেমনটিই রইলেন। বিজ্ঞান আজও তাঁর নাগাল পায়নি। বিজ্ঞান জানে না—কেন এই চতুর্মাত্রিক-ব্রহ্মাণ্ড এভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে—কে সেটাকে ফোলাচ্ছেন। বিজ্ঞান নীরব—‘প্রমাণাভাবাৎ’। এ আলোচনা শেষ করার পূর্বে আমার কাহিনীর এই পর্বের নায়ক প্রফেসর আলবার্ট আইনস্টাইন সে বিষয়ে যা বলেছেন সে কথা বলেই শেষ করি: My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble minds. That deeply emotional conviction of the presence of a superior reasoning power, which is revealed in the incomprehensible universe, forms my idea of God. [মানবচৈতন্যের দুর্বল ও ক্ষণভঙ্গুর বোধশক্তিতে ঐ যে অবাঙ্মনসগোচর পরমপুরুষ আভাসে-ইঙ্গিতে ছায়াপাত করে যান তাঁর প্রতি বিনম্র অভিভূতিই আমার একমাত্র ধর্ম। এই অপরিজ্ঞেয় বিশ্বরহস্যের মর্মমূলে এক পরম যুক্তিবাদী মহাশক্তির স্বয়ং প্রকাশনাকে আমি অনুভব করি; সেই গভীর ভাবাবেগানুপ্রাণিত সিদ্ধান্ত আমার চৈতন্যে যে প্রভাব বিস্তার করে তাকেই বলি আমার : ঈশ্বর।]

স্বীকার্য, অনুবাদ নিতান্তই ব্যর্থ। বস্তুত ঐ পংক্তিনিচয়ের বঙ্গানুবাদ আমার ক্ষমতার বাইরে। লক্ষণীয় superior spirit এ উনি বড় হরফের S ব্যবহার করেননি, ‘himself’ শব্দে ‘h’-কে ‘H’ করেননি। বক্তব্যের সেই অংশেও কথক শতকরা-শতভাগ বৈজ্ঞানিক; কিন্তু শেষ শব্দটিতে আইনস্টাইন তাঁর বৈজ্ঞানিক-সত্ত্বাকে অতিক্রম করে : সাধক!

* * * *

দীর্ঘ বিশ্লেষণ শেষ করে অধ্যাপক ইক্বাল আহমেদ থামতেই রাষ্ট্রপতি বলে ওঠেন, অসংখ্য ধন্যবাদ প্রফেসর আহমেদ, একটি অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ তত্ত্ব আপনার কৃপায় কিছুটা বোধগম্য হল, এতদিনে। আমি কৃতজ্ঞ। এবার ঐ সদ্যলঙ্ঘ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করে আমি নিঃসংশয় হতে চাই।

—বলুন? আমি সাধ্যমতো জবাব দেবার চেষ্টা করব।

—প্রথম কথা—চন্দ্রলোকের সেই অদ্ভুত ডুডেকাহেড্রন থেকে যে বেতারতরঙ্গ সেদিন মহাকাশের দিকে ছুটে গেল সেটার গন্তব্যস্থলের সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা আছে?

—আছে। সবাই জানে। পৃথিবীর যাবতীয় বিজ্ঞানাগার এবং মহাকাশ স্টেশনে অবস্থিত জ্যোতির্বিজ্ঞান-মন্দিরে সেটা সংশয়াতীতরূপে জানা গিয়েছে—বৃহস্পতি গ্রহের দিকে।

—কিন্তু কেন? বৃহস্পতি গ্রহ কিম্বা তার কোন উপগ্রহেই কি ‘তাঁদের’ বাস?

—আমি তা মনে করি না। ‘জীব’ বলতে আমরা যা বুঝি তা বৃহস্পতি গ্রহে কিম্বা তার তেরোটি উপগ্রহের কোনটিতে থাকতে পারে না। সেখানে আবহাওয়া নেই, অক্সিজেন নেই, জল নেই, উত্তাপ নেই।

—তাহলে?

—আমার বিশ্বাস—পাঁচ লক্ষ বছর আগে যাঁরা পৃথিবীতে এবং চন্দ্রলোকে এসেছিলেন তাঁরা বৃহস্পতির কোন উপগ্রহে হয়তো একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বসিয়ে রেখে গিয়েছিলেন—বেতারতরঙ্গ ধারক ও প্রেরক-যন্ত্র। এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে, পৃথিবীর হোমো-ইরেকটাসেরা যদি বিবর্তনের পথে কোনদিন মহাকাশচারণে সাফল্যলাভ করে এবং চন্দ্রলোকে পৌঁছে ঐ ডুডেকাহেড্রনটাকে খুঁড়ে বার করে তাহলে সেই ডুডেকাহেড্রন-স্থিত বেতারযন্ত্র ঐ বৃহস্পতির উপগ্রহে সংবাদ দেবে। বৃহস্পতির উপগ্রহস্থিত যন্ত্রটি সেই বেতার-বার্তা ধরবে এবং তাঁদের দেশে জানাবে।

—কিন্তু কোথায় তাঁদের সেই দেশ? কত দূরে?

—আমি জানি না।

—কিন্তু দূরত্বটা নিশ্চয় পনেরো আলোকবর্ষের চেয়ে বেশি নয়। অত কাছে তো মাত্র তিনটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে—আল্ফা-সেন্টরাই, লুব্বক এবং প্রশ্নন।

—পনেরো আলোকবর্ষের হিসাবটা কোথায় পেলেন?

যেহেতু দেখছি ১৯৭২ সালে প্রেরিত পাইওনিয়ার এফকে তারা ধরেছে। বৃহস্পতি গ্রহকে পাক দিয়ে সেটা ধনুরাশির দিকে যাবে এই স্থির ছিল। ওদের সেই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটা নিশ্চয় বৃহস্পতি গ্রহের কাছেই রকেটটাকে ধরে ফেলে এবং বেতার-যোগে তাঁদের রাজ্যে সংবাদ দেয়। হিসাবে দেখছি, সে বেতারতরঙ্গ যাতায়াতে প্রায় ত্রিশ বছর সময় নিয়েছে। ফলে ওঁরা যে নক্ষত্রের গ্রহে বাস করেন তার দূরত্ব পনেরো আলোকবর্ষের বেশি হতে পারে না।

প্রফেসর আহমেদ হাসলেন। বললেন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি কি সেই ছায়াজীবটির কথা ভুলে গেছেন?

—কোন্ ছায়াজীব?

—যে হতভাগ্য স্বচ্ছ ভূ-গোলকের দ্বিমাত্রিক প্রজেকশান দেখে এই ত্রিমাত্রিক পৃথিবীর স্বরূপটা বুঝে নেবার চেষ্টা করেছিল? ভূগর্ভ-ভেদকারী গুব্বরে পোকার গতিচ্ছন্দটা যার ধারণাতেই আসেনি—ভেবেছিল সেটা স্থির আছে!

প্রেসিডেন্ট অনেকক্ষণ জবাব দিলেন না। গাড়ি চিন্তায় যেন ডুবে গেছেন। শেষে বললেন, আর একটি কথা প্রফেসর। আমি শুনেছি, চন্দ্রলোকের সেই সঙ্কেতচিত্র দেখে আপনি বলেছিলেন, ঐ দূরত্বটা সম্বন্ধে আপনি একটা হিসাব করেছেন; হিসাবের ফলাফলটা আপনি ডক্টর শ্রীনিবাসনকে জানাতে রাজী হননি। আমাকে সেটি জানাবেন?

প্রফেসর আহমেদ বললেন, নিশ্চয়। আমার হিসাবে তাঁরা এই গ্যালাক্টিক সিস্টেমে নেই। এই গ্যালাক্টিক-ক্লাস্টারেও নেই। তাঁদের অবস্থান অ্যান্ড্রোমেডা-নীহারিকার অন্তত বিশগুণ দূরে পরবর্তী গ্যালাক্সিগুচ্ছে। পরবর্তী ক্লাস্টার-অব-গ্যালাক্সিতে। চার কোটি আলোকবর্ষ দূরে।

এবারও দীর্ঘ সময় নীরব রইলেন প্রেসিডেন্ট। অবিশ্বাস্য তথ্যটা হজম করতে সময় লাগা স্বাভাবিক। শেষ পর্যন্ত বললেন, হিসাবটা আমি বুঝব?

—বুঝবেন। চিত্রে (চিত্র—৮) লক্ষ্য করে দেখুন, আমাদের গ্যালাকটিক সিস্টেমের ব্যাস এক মিটার লম্বা। ঐ চিত্রের নীচে যে ইংরাজি ‘H’ অক্ষরটি আছে সেটাই আমাদের স্কেল। H অক্ষরের হাইফেনটুকুর মাপ হচ্ছে এক সেন্টিমিটার। ‘প্র’ থেকে ‘ও’-র দূরত্ব চার মিটার ৪০০ সেন্টিমিটার। যেহেতু প্রতি সেন্টিমিটার আমাদের গ্যালাকটিক-সিস্টেমের ব্যাসের প্রতিনিধিত্ব করেছে তাই মোট দূরত্বটা চার কোটি আলোকবর্ষ।

এতক্ষণে প্রেসিডেন্ট বললেন, কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য নয়?

—সেটাই প্রমাণ দিচ্ছে আমার হিসেবটা নির্ভুল।

—কী রকম?

—প্রফেসর নীল্‌স্ বোরের কাছে একবার একজন বৈজ্ঞানিক তাঁর থিয়োরি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। প্রফেসর বোর সবটা শুনে বলেছিলেন, আপনার থিওরি রীতিমতো অবাস্তব, কিন্তু যতটা অসম্ভব হলে এটা সত্য হতে পারত অতটা অসম্ভব যেন নয়। (Your theory is not impossible enough to be true!) আমার অঙ্কের ফলাফলটা যেন ‘impossible enough’ বলে মনে হচ্ছে না কি?

॥ আশির দশকের ‘কৈফিয়ৎ’ ॥

গ্রন্থটি রচনার পর এক যুগ অতিক্রান্ত—যদি দ্বাদশবর্ষকালকে ‘যুগ’ বলে ধরা যায়। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান অনেক-অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে। আইনস্টাইনের সূত্রগুলির নানান নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমি কিন্তু আলডুস্ হাক্সলের পদাঙ্ক-অনুসরণে এই সংস্করণে কোনও তথ্যগত পরিবর্তন করছি না। হাক্সলে তাঁর ‘ব্রেড নিউ ওয়ার্ল্ড’ লিখেছিলেন ১৯৩২-এ; পরবর্তী সংস্করণে তার কোনও তথ্যগত পরিবর্তন করেননি, যদিও ততদিনে পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ হয়েছে। বরং তিনি লিখেছিলেন, ‘ব্রেড নিউ ওয়ার্ল্ড রিভিজিটেড’ (১৯৫৯)। আর্থার সি. ক্লার্কও তাঁর ‘স্পেস ওডিসি ২০০১’-কে অপরিবর্তিত রেখে রচনা করেছিলেন, ‘স্পেস ওডিসি ২০১০’।

আমি স্বভাবগতভাবে পল্লবগ্রাহী। ‘নক্ষত্রান্তরলোকে’র কথায় আমার মন নেই। বর্তমানে মেতে আছি কীট-পতঙ্গ নিয়ে। সারা গায়ে মহানন্দে মাখছি এই ‘মধুময় ধরণীর ধূলি’-ই!

আশা করি আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন।

নারায়ণ সান্যাল

২৬.৪.১৯৮৭

A Book of Kuntal